ব্রজবুলি

ব্রজবুলি

রূপদর্শী

বর্তিক
কলিকাতা—২৬

প্রথম প্রকাশ :

মহালয়া। চৌঠা আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক :

অমল কান্তি সেনগুপ্ত
বর্তিক-এর পক্ষে
১/৩২ এফ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলিকাতা ২৬

মুদ্রাকর :

নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, প্রাঃ লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা ১৩

প্রচ্ছদপট ও অংগসজ্জা :

অহিভূষণ মালিক

প্রাপ্তিস্থান :

গ্রন্থভারত
৪১-বি রাসবিহারী অ্যাভেনিউ
কলিকাতা ২৬

কথাশিল্প

১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

জগতে ব্রজদা একটিই জন্মান। ও'র আর জুড়ি নেই। তবু যদি কেউ—জীবিত অথবা মৃত—নিজেকে ব্রজদা বলে চালাবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁর দায় তাঁরই, লেখকের নয়।

হ্যাঁ, আর একটি কথা, ব্রজবুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশকালে কেউ কেউ আমাকে জানিয়েছেন, ব্রজদার কোন কোন বুলি শুনলে নাকি এর ওর তার কথা মনে পড়ে। কথাটা ব্রজদাকে বলেছিলাম। উত্তরে ব্রজদা বললেন, দেয়ার আর মেনি থিংস্ ইন্ হেভেন অ্যান্ড আর্থ, বুঝলি।

ব্রজদা বলেছেন, তাঁর কাহিনী নির্ভেজাল সত্যি। (অবিশ্যি সত্যি যতটা নির্ভেজাল হওয়া সম্ভব, ততটা)। আমার রচনা সম্পর্কে ব্রজদার ধারণা খুব পুওর। বলেছেন, আমার জীবনে অ্যাকচুয়াল যা ঘটেছে, তাই ওকে বলেছি, তার সিকিটাও ও ফোটাতে পারেনি। এর উপর যদি গুল মারতুম, তাহলে সেগুলো তো ওর কলমের রেঞ্জেই আসত না।—রূপদর্শী

বরাহনগর, মহালয়া,
১৩৬৫ সাতষট্টি॥

অন্যান্য বই : এই কলকাতায়, নকশা, সার্কাস, নাচের পুতুল, কথায় কথায়, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, চেনামুখ, মন মানে না, জল পড়ে পাতা নড়ে, মেঘনামতী, অন্নপূর্ণা।

প্রকাশের অপেক্ষায় : এই দাহ, জলবত্তরলম্, জবালা, মহাত্মা হরিদাস পালের জীবন ও বাণী॥

ব্রজদাকে

এক

ব্রজরাজ কারফর্মা বাবুকে যিনি চেনেন না, এ কাহিনী তাঁর জন্য নয়। কারণ তিনি এ কাহিনী শুনে ঠিক বিশ্বাস করতে পারবেন না। অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন। হয়ত প্রবল মূঢ়তা-বশে ব্রজদার সঙ্গে তর্কই জুড়ে দেবেন। আর মুহূর্তে ব্রজদা সে স্থান ত্যাগ করবেন। আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাব ঃ বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। ব্রজদা একটা আফশোষ প্রায়ই করেন ঃ বাঙ্গালীর মানসিক হজমশক্তি আর আগের মত নেই। কোন কিছু প্রাণে ধরে বিশ্বাস করতে পারে না। আর যেদিন থেকে বাঙ্গালীর এই হজমের গোলমাল হয়েছে, সেদিন থেকেই তার অধঃপতনের সুরু।

আমি অবিশ্বাসী নই। তাই ব্রজদাকে পেয়েছি। আর যে কলকাতায় জীবন অনিত্য, যে কোন মুহূর্তে যেখানে সরকারী বাসের চাকায়, হাসপাতালের চিকিৎসা বিভ্রাটে, পুলিশের গুলিতে অথবা পাবলিকের ইঁটে প্রাণটি যেতে পারে, সেখানে হঠকারি অবিশ্বাসের ফেরেববাজিতে পড়ে কোন মূল্যেই ব্রজদাকে হারাতে পারিনে।

ব্রজদা যে সে লোক নন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার

পেয়েছিলেন ব্রজদার পরামর্শে। একথা কিন্তু অনেকেই জানে না। আপনি কি জানেন, অন্নদাশঙ্কর রায়কে বাংলা শিখিয়েছে কে? দেশবন্ধুকে কলকাতার মেয়র, শ্রীনেহেরুকে ভারতের প্রাইম মিনিস্টার, গান্ধীজীকে মহাত্মা করল কে? সত্যেন বোসকে আইনস্টাইনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কে? ব্রজরাজ কারফরমা। বাঙ্গালীর ইতিহাস বাঙ্গালী নিজেই জানেনা!

সত্য বাংলাদেশে চিরকালই উপেক্ষিত। বাঙ্গালী ইতিহাসকে কোনদিন মর্যাদা দিতে শেখেনি। তাই ব্রজদাকে বাঙ্গালী চিনতে পারল না। এতে ব্রজদার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। যে ব্রজদা তিনি সেই ব্রজদাই আছেন। মাঝখান থেকে বাঙ্গালীর ইতিহাসটাই পঙ্গু হয়ে গেল।

তাই এতকাল পরে, বাঙ্গলা দেশকে অপূরণীয় এক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, আমি ব্রজদার জীবনচরিত রচনা করতে বসেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের যেমন শ্রীম—, ডাঃ জনসনের যেমন বসওয়েল, ব্রজদার তেমন আমি। তাই ব্রজদা যখন যা বলেছেন আমি সযত্নে টুকে রেখেছি।

ব্রজদার মুখের বুলি, তাই নাম দিয়েছি ব্রজবুলি।

একদিন কয়েকজন ছোকরা কবি তর্ক করছিল। তাদের একদলের মতে বলাকা থেকেই রবীন্দ্র প্রতিভার ম্যাচুয়েরিটি প্রকাশ পেতে থাকে।

ব্রজদা সে কথা শুনে হাসলেন। পরিতৃপ্তির হাসি। বললেন, ঠিক ধরেছে, বুঝলি। পেটে এলেম আছে, বোঝা যাচ্ছে। ভাগ্যিস সেদিন কবিকে হাঁসের উপর একটা কবিতা লিখতে পীড়াপীড়ি করেছিলুম।

সুদূর অতীতের অন্ধকারে স্মৃতির সার্চ লাইট ফেলে ফেলে

ব্রজদা কি যেন খুঁজলেন কিছুক্ষণ। তারপর যা খুঁজছিলেন তা যেন হঠাৎ পেয়েও গেলেন।

ব্রজদা বললেন, বাপ সে কি আজকের কথা! নাইনটিন ফোরটিন। তখন বড়লাট সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে বড়দিনটা কলকাতায় কাটাতেন। বড়লাটের এডিকং তখন খাস বিলেত থেকে আসত। বৃটিশ ফৌজের সেরা সেরা লোক আনা হত বড়লাটের এডিকং করার জন্য। বুঝে নে ব্যাপারখানা। কর্ণেল ক্লিম্যাণ্ট বলে তখন জাঁদরেল এক এডিকং ছিল বড়লাটের। ধরতে গেলে সেই কর্ণেলই কবির বলাকা কবিতা লেখার মূলাধার। এসব হিস্ট্রি ত কেউ জানেনা। শুধু ফাট-ফ্যাট করে।

তা থাকগে সে কথা আরেকদিন বলব। আজ কর্ণেল ক্লিম্যাণ্টের সঙ্গে আমার আলাপের কাহিনীটাই বলি।

ব্রজদা বললেন, কর্ণেল ক্লিম্যাণ্টের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামে একবার লড়তে গিয়েছিলাম। ঐ এক লড়াই-এর পরেই দুজনের মধ্যে হাতে-দস্তানায় ভাব জমে গেল। ব্যাটা বিলাতের চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর ছিল। সাত ফুট লম্বা। সাড়ে চার মন ওজন। বুকের ছাতিই ছিল ছাপ্পান্ন ইঞ্চি। ছয় ইঞ্চি ফোলাতে পারত। সে আমলের গোরা ত। তোরা একালের ছোকরা, আইডিয়া করতে পারবি নে। রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসখানা পড়েছিস ত। ক্লিম্যাণ্টের কিছুটা আদল রবীন্দ্রনাথ গোরা চরিত্রে ফোটাতে চেয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি, পারেন নি। তা কর্ণেল ক্লিম্যাণ্ট যদি হয় ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন তবে গোরা হচ্ছে হাওড়া আমতা রেলের ঐ ধুকুস ধুকুস চুনোপুঁটি ইঞ্জিন। এবারে আন্দাজ করে নে।

সেই ঘটোৎকচের সঙ্গেও আমাকে কুস্তি লড়তে হয়েছে। ন্যাশন্যাল স্পিরিটটা তখন আমাদের মধ্যে এমনি তেজী ছিল। বুঝলি! এ কী তোদের স্বাধীনতা আমলের নেতাগিরি করা! হুঁ!

গোরাদের সঙ্গে তখন কথায় কথায় টক্কর দেওয়া হত। হলামই বা আমরা পরাধীন। আমাদের দেশটাই তোমরা না হয় দখল করেছ, কিন্তু বাঙ্গালীর তেজটা ত আর দমন করতে পার নি। বৃটিশ ত ছার, শক হুণ দল পাঠান মোগল, কে এঁটে উঠতে পেরেছে বাঙ্গালীর সঙ্গে, দেখা দিকিনি হিস্ট্রিতে। আমাদের আমলে আমরা ছিলাম সেই তেজী হিস্ট্রির বাচ্চা।

হ্যাঁ, যা বলছিলুম। ফোর্টে বড়দিনের সময় কুস্তি হত। চ্যাম্পিয়নকে বড়লাট গিন্নী নিজের হাতে মেডেল পরিয়ে দিতেন, আর আর, তার গালে এই—মানে একটা কিস্ করতেন। ওটা হল ওদের দেশের সিস্টেম, জাতীয় শুল্ক অর্থাৎ কিনা যাকে তোরা ন্যাসন্যাল কাস্টম বলিস, ও পিওর জিনিস, ওতে দোষ নেই বুঝলি।

যাহোক, আমরা সেসব কুস্তি দেখতে যেতাম। সেবার হল কি, এডিকং কর্নেল সাহেবও নেমে পড়ল রিঙে। শুনলুম, অ্যামেচাররাও এবার কেদ্দানি দেখাতে পারবে। আমার ত হাত নিশপিশ করতে লাগল। কিন্তু উপায় কি, কে আমাকে চেনে। তাই চুপ করে বসে থাকলুম। কর্ণেল সাহেব লড়লে বটে। বাঘা বাঘা প্রোফেশন্যালরাও পুরো রাউণ্ড কেউ ওর সঙ্গে লড়তে পারল না।

কর্ণেল সাহেব শেষ লোকটাকেও চিৎ করে উঠে দাঁড়াল। চটাপট চটাপট হাততালি। সে আর কান পাতা যায় না। বড়লাটের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছোটলাট তো হুররে হুররে বলে লাফিয়েই উঠলেন। ভাইসরয়-গিন্নী লাট-গিন্নী তালি বাজালেন। তাইতেই কর্ণেল ব্যাটার মরণের পাখনা চাগিয়ে উঠল বোধ হয়। সে ব্যাটা চ্যালেঞ্জ করে বসলে, যদি কেউ লড়তে চাও এস। ইণ্ডিয়ান কি বৃটিশ, যে ইচ্ছে আসতে পার। আর কেউ যদি চ্যালেঞ্জের জবাব না দাও, কেউ ভয়ে লড়তে না আস, তবে বুঝব,

ইণ্ডিয়ায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। তখন আমি ইণ্ডিয়ান চ্যাম্পিয়ন বলে নিজেকে ডিক্লেয়ার করব। টাইটেল নেব রুস্তম-ই-হিন্দ।

সেটা নাইনটিন ফোর্টিনের যুগ। পুরো দমে ওয়ার চলছে। আমাদের বাঙ্গালীদের পল্টনে নেয় নি। সেটা একটা ন্যাশন্যাল ইনসাল্ট ত, বুঝলি নে গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। ডিসেম্বরের শীতেও গায়ে সেরেফ একটা খদ্দরের বেনিয়ান। মানে ইয়ং ব্লাড্ ত। তার উপর ব্যাটা আবার মুখের উপর চ্যালেঞ্জ করলে। এ কী সহ্য হয়। দাঁড়িয়ে বললাম, আই অ্যাক্সেপ্ট। ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেই ভাবলাম, হেরে গেলেই কেলেঙ্কারী। ভারত মাতার মুখে চুনকালি পড়বে। যাহোক গোপনে, মনে মনে, তিন তিনবার বন্দে মাতরম্, ভারত মাতা কি জয় বলে ত উঠে দাঁড়ালাম।

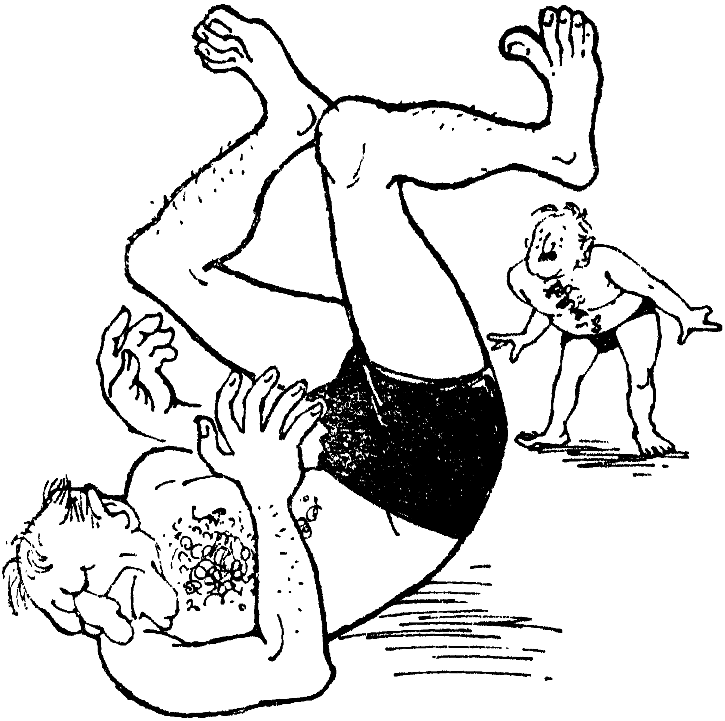
সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্ণেলের চোখ ট্যারা হয়ে গেল। দেখলুম বড়লাট-গিন্নীও আমার দিকে চেয়ে নিলেন। আবার হাততালি পড়ল। সবাই ঠেলেঠুলে আমাকে রিঙে তুলে দিলে। সে এক দৃশ্য! আমার মাথার উপর ব্যাটা আরো দেড় দু ফুট লম্বা। অন্য লোক হলে হয়ত নার্ভাস হয়ে পড়ত। অন্য সময় হলে আমিও যে কি করতুম বলতে পারি নে। কিন্তু তখন আমার হাতে ন্যাশন্যাল প্রেস্টিজ, সব সময় মনে হচ্ছে এই বুঝি সেটা পাংক্চার্ড্ হয়ে যাবে, বুঝতেই ত পারছিস। কিন্তু তোরা এখানকার জেনারেশান ত, তোদের সে রকম ফিলিংসই নেই। হয়ত ঠিকমত বুঝতে পারবি নে।

যাক, তেড়ে ফুঁড়ে ত উঠলুম। কিন্তু ড্রেসট্রেস করতে হবে ত। কিছুই ত আনিনি। ড্রেসিং রুমে নিয়ে গেল। দেখি থরে থরে সব বিলিতি জাঙ্গিয়া টাঙানো রয়েছে। তা সাহেবদের

জাঙ্গিয়া কি আমাদের লাগে? পেল্লায় পেল্লায় সব সাইজ। রিয়েল গোরা ত দেখলি নে জীবনে! তা যাক গে, এ এক আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লাম। এক একটা জাঙ্গিয়া পরতে যাই আর সেটা আমার বুক অব্দি উঠে আসে। সাইজ মত একটা জাঙ্গিয়ার অভাবেই সেদিন জাতির মান প্রায় যেতে বসেছিল আর কি? ভাগ্যিস এদিক ওদিক চেয়ে এক ভোজপুরি দারোয়ানকে পেলুম। তার ল্যাঙ্গটটা চেয়ে নিয়ে ড্রেস করলুম। তারপর জয় মা কালী বলে রিঙে গিয়ে উঠলুম। সমবেত দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে আমাদের ফাইট দেখতে লাগল।

আমি ছ' রাউণ্ড ফাইট দিলাম! কর্ণেল ব্যাটা আমার টিকিও ছুঁতে পারল না (তা বলে সত্যিই আমার কিছু টিকি ছিল না)। কর্ণেল ব্যাটা যত প্যাঁচই ঝাড়তে যায়, আমি ততই কাটান প্যাঁচে সরে পড়ি। সত্যি বলতে কি, তখনও পর্যন্ত আমি কুস্তির কোন প্যাঁচই ঝাড়িনি, সেরেফ চু-কিৎ কিৎ খেলার কায়দাতেই আমি ওকে কাটান মারছিলাম। তার উপর আমি ওর চাইতে বেঁটে ছিলাম বলে ইজিলি ওর পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে পারছিলাম। সিক্‌স্‌থ্‌ রাউণ্ডেও আমাকে কাৎ করতে না পেরে ব্যাটা বেশ ঘাবড়ে গেল। সাত রাউণ্ডের মাথায় একটু অসতর্ক হয়েছে কি, ব্যাটাকে মারলাম এক জবর ল্যাং। একেবারে বিশুদ্ধ বাঙ্গালী মতে। যাই বলিস আর তাই বলিস, ল্যাং মারায় বাঙ্গালীর কাছে ওয়ার্লডের কেউ দাঁড়াতে পারে না। নেই নেই করেও এই বিদ্যেটি বাঙ্গালীর এখনও আছে। আর এই ল্যাং মারার ঐতিহ্য বাঙ্গালী যতদিন বজায় রাখতে পারবে ততদিন হোয়াট বেঙ্গলি থিংক্‌স্‌ টুডে ইণ্ডিয়া উইল থিংক টুমরো।

ফল পেলাম হাতে হাতে! ল্যাংখানি খাবার সঙ্গে সঙ্গে বাছাধন কাৎ, অর্থাৎ প্রথমে কাৎ এবং পরে চিৎ। নট নড়ন চড়ন,



মারলাম বিশুদ্ধ এক বাঙ্গালী ল্যাং

নট কিচ্ছু। রেফারি আমাকেই উইনার ডিক্লেয়ার করলে। আবার পটাপট হাততালি, হুররে হুররে চীৎকার। কর্ণেল সাহেব অতিকষ্টে উঠে হ্যাণ্ডসেক করল। বলল, ব্র্যাভো বাবু, ব্র্যাভো!

বড়লাট গিন্নীর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করলেন। বড়লাট, ছোটলাট, মেম্বর, মাতব্বর সবাই আমার হাত ঝাঁকালেন। চাদ্দিক থেকে খালি হুররে ব্রজদা, হুররে ব্রজদা। কানে মাইরি তালা লেগে যাবার উপক্রম।

বড়লাট-গিন্নী আমার গলায় মেডেলটি পরিয়ে দিয়ে কিস্‌টি

করবার জন্য আমার মুখখানা যেই ওর পাউডার পমেটম মাখা মুখের কাছে টেনে নিলেন, অমনি আমি বেঁকে দাড়ালাম।

বলে উঠলাম, সরি ম্যাডাম! আই কাণ্ট টেক ইট। ওটা নিতে পারব না।

মেম-সাহেব বড়লাটের বউ। এমন কথা জন্মে শোনেন নি। ওঁর কাছে এটা ত রীতিমত বেয়াদবি। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর চটে ফায়ার।

বললেন, কেন?

কিন্তু আমি ব্রজ। ওতে কি আমি ঘাবড়াই। জাতীয় রক্ত টগবগ করে উঠল। বুক ফুলিয়ে বললাম, ম্যাডাম ওটা ফরেন গুড্‌স্। এখন স্বদেশী আন্দোলন চলছে। বিলাতী মাল আমরা বয়কট করেছি কি না।

দুই

আপনাদের সাবধান করে দিয়েছিলাম, ব্রজরাজ কারফর্মা যখন মুখ খুলবেন তখন তাঁকে কোন-মতেই ডিস্টার্ব করবেন না। ব্রজদার কথা শোনবার একটাই মাত্র সর্ত আছে, কান পেতে শুধু শুনে যাওয়া। প্রশ্ন নয়, তর্ক নয়, পিছনে সামনে হাসি নয় এমন কি চোখ টেপাটেপি পর্যন্ত নয়। অবিশ্বাসীর গন্ধ পেলেই ব্রজদার মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

ব্রজদা বাংলাদেশ ও জাতির উত্থানপতনের ইতিহাসের এমন নেপথ্য সব অধ্যায় জানেন (অনেক ক্ষেত্রে সেসব অধ্যায়ের স্রষ্টা ব্রজদা নিজেই) যেগুলো সাধারণ বাঙ্গালীর জানা নেই বলেই ত বাঙ্গালীর আজ এই দুর্দশা। আত্মবিস্মৃতির অতল অন্ধকারে বাঙ্গালী আজ তলিয়ে আছে। বাঙ্গালীকে ওঠাবার জন্য, জাগাবার জন্যই ব্রজদার কাহিনী বলা দরকার। বাঙ্গালীর উচিত বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান ব্রজদাকে চেনা।

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদে হাত দিয়ে ব্রজদাকে মাঝে মাঝে পড়ে শোনাতেন। একদিন কবি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্রজ, কি রকম বুঝছ? ব্রজদা কবিকে অভয় দিলেন, পড়ে যান না, ভয় কি? আমি ত আছি। এই আশ্বাস কবিকে

যে কি পরিমাণ উৎসাহিত করেছিল এবং তার ফলে জগৎসভায় বাঙ্গালী যে শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পেরেছিল, বিশ্বের লোক আজ তার সাক্ষী। তাঁহলেই বোঝা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাবার পিছনে ব্রজদার অবদান কতখানি। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য এ ইতিহাস আমরা জানিনে। আমরা এও ত জানিনে, বলাকা কবিতা লিখতে ব্রজদাই কবিকে খুঁচিয়েছিলেন।

সেদিন ব্রজদা সবিস্তারে যখন এই কাহিনী বলতে শুরু করেছিলেন, তখন কোন মূঢ় যেন পিছন থেকে খুক খুক করে হেসে ফেলেছিল। ফলে ব্রজদা তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করেছিলেন। পরে বহু কষ্টে আমাকে সে কাহিনী ব্রজদার মুখ থেকে বের করতে হয়েছে। তাই আপনাদের পঁই পঁই করে বারণ করি, ব্রজদার সামনে বেচাল হবেন না। বাংলা ও বাঙ্গালীর আশু সর্বনাশটি ঘটাবেন না।

বলাকা কবিতা লেখাবার হিষ্ট্রি এখানে বলতে বসিনি। আসলে এ কাহিনী ব্রজদার এফিসিয়েন্সির। তবু পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য অতি সংক্ষেপে সেই হিষ্ট্রিই আগে বলছি। ভাইসরয়ের জাঁদরেল এডিকং কর্ণেল ক্লিম্যাণ্টকে কুস্তিতে হারিয়ে দেবার পর ব্রজদা আর কর্ণেল সাহেবের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কর্ণেল সাহেবের নেমন্তন্ন পেয়ে ব্রজদা সেবার কাশ্মীরে বেড়াতে যান। কার্তিক মাস। পাহাড়ে পাহাড়ে শীত এসে পড়েছে। বরফ জমতে শুরু করেছে। চিনার গাছের পাতা ঝরে ঝরে শ্রীনগর শহরের পথে পথে খালে 'ডালে' ছড়িয়ে পড়েছে। হাউসবোটে আর শিকারায় ঘুরে ঘুরে ব্রজদা কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে হাঁস মেরে বেড়াচ্ছেন। ওঁরা দুজনেই মহারাজার গেষ্ট। ব্রজদা শিকারা চালিয়ে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করায় মহারাজা ব্রজদাকে সুন্দর একখানা তলোয়ার উপহার দিয়েছিলেন।

ব্রজদা বললেন, প্র্যাকটিকেলি সেই অলোয়ার থেকেই কবি 'বলাকা'র প্রেরণা পান। তবে শোন, আমি আর কর্ণেল সাহেব একদিন শিকারার বাইচ খেলছিলাম।

সেই শিকারার বাইচ নিয়েই ত হঠাৎ একটা এক্সিডেন্ট ঘটে গেল। আর ধরতে গেলে বলাকার সূত্রপাত হল সেই এক্সিডেন্ট থেকে।

কর্ণেল সাহেবের খেয়াল চাপল শিকারার বাইচ খেলবে। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের রিগাটার কথা বোধ হয় মনে পড়ে গিয়েছিল কর্ণেল সাহেবের। সাহেব ছিল চ্যাম্পিয়ন হাল ধরিয়ে। বললে, ব্রজ, তুমি ত বেঙ্গলি, নৌকো বাইচ্ শুনেছি তোমাদের ন্যাশন্যাল স্পোর্টসের মত। হারলে যদি লজ্জা না পাও ত এস এক হাত লড়ে যাই। ন্যাশন্যাল প্রেস্টিজে ঘা পড়লে ব্রজদা আর স্থির থাকতে পারেন না। সে ত আমরা বরাবর দেখেছি। ব্রজদা তৎক্ষণাৎ বললেন, আই অ্যাকসেপ্ট।

ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে এক সাইজের দুখানা শিকারা মহারাজা বের করে দিলেন। গোটা শ্রীনগরে সে কি উত্তেজনা! কাতারে কাতারে লোক জুটে গেল ডাল লেকের ধারে ধারে। হাজার হাজার হাউস বোট ভাসল জলে। মহারাজা মহারাণী আর মহারাণীর এক ভাইঝি স্পেশ্যাল বোটে করে এলেন। ব্রজদা মহারাণীর ভাইঝির যা বর্ণনা দিয়েছিলেন তাতে আমার মনে হয়েছিল, ফিল্মের ষ্টাররাও তার কাছে সীসের সিকির বেশি কিছু নয়। (ব্রজদা বলেছিলেন ঃ খাস কাশ্মীরী বিউটি যে কি জিনিষ সে তোরা আইডিয়া করতে পারবিনে। ওসব বর্ণনা করা যায় না। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ভাষায় বলতে হয়, প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই অতি উত্তম।)

শিকারায় উঠবার আগে রাজকুমারী চম্পাকলী (চাঁপার

কলিই বটে!) ব্রজদার হাত ধরে বলেছিলেন, মাই ডিয়ার, বিরজু, জাতির প্রেস্টিজ তোমার হাতে। আমি শালিমার গার্ডেন থেকে ফুল তুলিয়ে রেখেছি, বেষ্ট শাল যে পশমের সূতো দিয়ে তৈরী হয়, সেই সূতো আনিয়ে রেখেছি। তোমরা স্টার্ট দিলেই মালা গাঁথতে বসব। মনে রেখো, সে মালা তোমার জন্যে তোলা থাকবে।

ব্রজদা আত্মপ্রত্যয়ের হাসির ছিঁটে রাজকুমারীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হেসে শিকারায় এসে উঠলেন। ব্রজদা আর কর্ণেল সাহেব রেডি হয়ে বসতেই মহারাজা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে স্টার্ট দিলেন। ব্রজদা মনে মনে বদর বদর বলে দাঁড়ে টান দিতেই দেখেন রাজকুমারী চম্পাকলি সূতোর সূচে একটি ফুল গেঁথেছেন! ব্রজদা ঘাড় ঝুঁকিয়ে ইশারা করতেই রাজকুমারীর মুখের হাসি শরতের রোদ হয়ে যেন লেকের জলে ছড়িয়ে পড়ল।

ব্রজদা ইন্জিলি জিতে গেলেন। কিন্তু কর্ণেল ব্যাটা নার্ভাস হয়ে একটা এক্সিডেন্ট বাধিয়ে বসল। শিকারার সেই তীরের মত গতি সামলাতে না পেরে এক হাউসবোটের গায়ে গিয়ে মারল প্রচণ্ড ধাক্কা। বোটটা পোক্ত ছিল বলে ক্ষতি কারও কিছু হল না। কিন্তু একটা অপূর্ব সুন্দর বাঁধানো খাতা ছিটকে বেরিয়ে এল বোটের ভিতর থেকে। আকাশে একটা প্যারাবোলা এঁকে। ব্রজদার মাথার উপর দিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে গেল। খাতার মলাটে সোনার জলে যে নামটা লেখা ছিল সেটা রোদের আলোয় ব্রজদার চোখে এসে বিঁধল। "রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।" হ্যাঁ, ওহাতের লেখা ত ভুলবার নয়। ব্রজদা মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফুল স্পীডে শিকারা চালিয়ে দিলেন। ঝপাঝপ দুখানা দাঁড়ে গোটা আস্টেক হিঁচকে টান মারতেই তীরের বেগে শিকারাখানা এগিয়ে গেল। আর খাতাটা জলে পড়তে না পড়তেই ব্রজদা বাঁ হাতে খপ করে সেখানা ধরে ফেললেন। শিকারার স্পীডে

সেদিন যে রেকর্ড সৃষ্টি করলেন ব্রজদা আজও তা কেউ ভাঙতে পারেনি।

কবিকে খাতাটা নিয়ে দিতেই কবি বিস্ময়ে বলে উঠলেন, ব্রজ তুমি! খাতাখানা খুব বাঁচিয়েছ। নতুন ধরনের কাব্য রচনা করব বলে ওখানা যত্ন করে বাঁধিয়ে এনেছি, আজকেই ট্রাঙ্ক থেকে বের করলেম। আর তার পরেই এই বিপত্তি, উঃ খুব বাঁচিয়েছ।

ব্রজদা কথা না বলে কবির পায়ের ধূলো নিলেন। তারপর থেকে কবি যতদিন শ্রীনগরে ছিলেন ব্রজদা রোজ সন্ধ্যায় কবির সঙ্গে গল্প-গুজব করতে তাঁর হাউস বোটে যেতেন। কর্ণেল সাহেব যতবড় বন্ধুই হোন, আর রাজকুমারী চম্পাকলী যতবড় সুন্দরীই হোন (রাজকুমারী ব্রজদার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। কিছুতেই কাছছাড়া করতে চাইতেন না। এদিকে অফিসে এন্তার কামাই হচ্ছে! নতুন চাকরী। প্রিভিলেজ লিভ্, ক্যাজুয়েল লীভ্ শেষ হয়ে গেল, মেডিকেল লীভ্ গেল, শেষ পরে যখন লীভ্ উইদাউট পে হবার উপক্রম, তখন ব্রজদা মরীয়া হয়ে পালিয়ে আসেন। সে আরেক হিষ্ট্রী। পরে বলা যাবে।) বাংলায় কথা বলতে না পারলে বাঙ্গালী হাঁপিয়ে মরে। নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা। এ বিষয়ে বাঙ্গালী আবার বড্ড গোঁড়া। এতদিন ইংরেজী বলে বলে ও ভাষাটার উপর ব্রজদার অরুচি ধরে গিয়েছিল। তাই কবিকে পেয়ে ব্রজদা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। সন্ধ্যে বেলায় বোটের ছাতে বসে বসে ব্রজদা কবিকে লেখার বিষয়ে আইডিয়া দিতেন। সেই সময় একদিন এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যেতে ব্রজদা বললেন, আচ্ছা আপনি এই হাঁস নিয়েই ত একটা পোয়েট্রি লিখতে পারেন। সাজেশানটা সেদিন কবির খুব মনঃপূত হল। বললেন, চেষ্টা করে দেখব।

তারপর অনেকদিন ব্রজদা কবির ওখানে গিয়েছেন। ব্রজদার কোমরে রাজকুমারী চম্পাকলী নিজের হাতে তলোয়ারটা বেঁধে দিয়েছেন। আবার তারও একটা হিষ্ট্রী আছে। কিংখাবের খাপখানার সঙ্গে রঙ মিলিয়ে রাজকুমারী নিজের হাতে ব্রজদার জন্য কাশ্মীরী শালের একটা সবুজ পান্না রঙের কোমরবন্দ বুনে দিয়েছিলেন। সেই কোমরবন্দে তলোয়ার ঢুকিয়ে ব্রজদার কোমরে বেঁধে দিয়েছিলেন রাজকুমারী। নিজ হাতে।

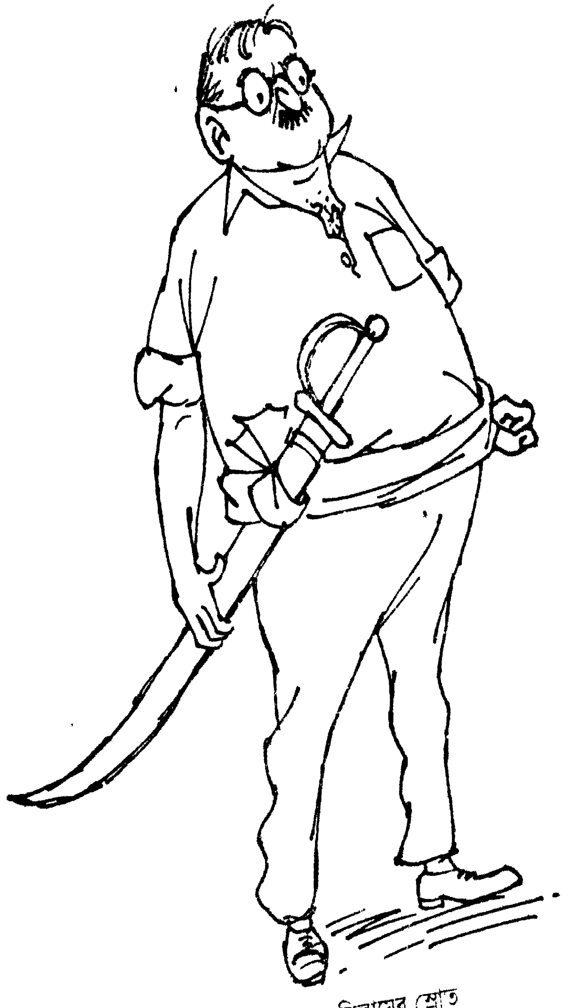
কবি তলোয়ারখানা দেখে খুব খুশী। বারবার নেড়ে-চেড়ে দেখেন আর বলেন, এটা তো বেশ জিনিব হে ব্রজ। কি চমৎকার, কেমন সুন্দরভাবে বাঁকানো।

ব্রজদারও সেদিন কেমন যেন ভাব লেগে গেল। কোমর-বন্দে রাজকুমারীর ছোঁয়া। তার উপর কবির প্রশংসা। যেমন বাল্মিকীর মুখ দিয়ে মা নিষাদ শ্লোকটা ফস করে বেরিয়ে গিয়েছিল, তেমনি ব্রজদার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আজ্ঞে ঠিক যেন ঝিলমের বাঁকা স্রোতেরই মত।

কবি চমকে উঠলেন। দি আইডিয়া। থ্যাঙ্ক ইউ ব্রজ। পেয়ে গেছি। ইউরেকা। তারপর ধ্যান মগ্ন হয়ে বোটের ছাতে তক্ষুনি তক্ষুনি বসে গেলেন। বসে বসে সেই বাঁধান খাতার প্রথম পাতায় মুক্তোর মত হস্তাক্ষরে ফস্-ফস্ করে লিখে গেলেন ঃ

সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার········

এই হল বলাকা কবিতা লেখার সংক্ষিপ্ত হিষ্ট্রি। এর মধ্যে, এই তিনটে ছত্রের মধ্যে বাঙ্গালীর যে গৌরবময় ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, কজন বাঙ্গালী তার খবর রাখে। নিজেরা ত খবর রাখেই



বাঁকা তলোয়ার যেন ঝিলামের স্রোত

না, ব্রজদা যদি উপযাচক হয়ে বলতেও যান, অমনি তারা হেসে উড়িয়ে দিতে চায়।

ব্রজদা বললেন, এই একটা দোষেই বাঙ্গালী গেল।

বলাকার কথা থাক, এফিসিয়েন্সির কথা বলি।

সেদিন কথা হচ্ছিল জীবনবীমা নিয়ে। এফিসিয়েন্সির কথা উঠল। যত্তদা বলছিলেন, ন্যাশনালাইজ করবার পর জীবনবীমা অফিসের এফিসিয়েন্সি জাহান্নামে গিয়েছে। প্রিমিয়াম জমা দিলে এক বছর লাগে রসিদ আসতে।

সুনীল বোস টাইপ মেসিনের খটখটি থামিয়ে বলল, ন্যাশানালাইজ করবার পর কোন জিনিষেরই বা এফিসিয়েন্সি থাকে। ষ্টেট বাস বল, রেল বল গভর্ণমেণ্টের হাতে গিয়েছে কি তার বারটা বেজে গেল।

সুনীত ঘোষ বলল, এ আমাদের ন্যাশন্যাল ক্যারেক্টারের দোষ মশাই। সাহেব কোম্পানীর মত এফিসিয়েন্সি দেশী কোম্পানী দেখাতে পারে না।

ব্রজদা চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণ একটা কথাও বলেন নি। কিন্তু আর থাকতে পারলেন না। বললেন, তোদের জেনারেশানটাই দেখছি বড্ড ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সে ভোগে। আমাদের আমলে এটা ছিল না।

এখন তোরা স্বাধীন হয়ে যেসব কথা বলিস, সেই পরাধীনতার আমলে সাহেবরা ওসব কথা বলত। আর আমরা তাদের থোঁতা-মুখ ভোঁতা করে দিতাম।

সেই স্বদেশী আমলে একটা স্বদেশী বীমা কোম্পানী খোলা হয়েছিল। তখন রুল ব্রিটানিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর খুব প্রতাপ। ওদের স্যার ফোরটোয়েন্টি বলে ঝানু এক স্কচ সাহেব ছিল ফিল্ড এজেন্টদের কর্তা। সেই সাহেব কোম্পানীর দাপটে স্বদেশী বীমা কোম্পানী যখন লাটে ওঠার উপক্রম হল, তখন স্যার

রাজেন আমাকে রিকোয়েষ্ট করলেন, ফিল্ড এজেন্টদের পরিচালনার ভার নিতে। বলেছিলেন, এটাকে কেউ যদি দাঁড় করাতে পারে, তবে তুমিই পারবে, ব্রজদা। আমি ওটাকে প্রফেশন নয়, মিশন হিসাবে টেক আপ করলাম।

একদিন স্যার ফোরটোয়েন্টিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহেব তোমাদের কোম্পানীর এত পসার কেন বলতে পার? অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।

স্যার ফোরটোয়েন্টি বললেন, আপত্তি কিসের। এ ত ওপেন সিক্রেট। এফিসিয়েন্সি ম্যান, সেরেফ্ এফিসিয়েন্সি। আমাদের ক্লায়েন্ট মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হিসাব-পত্র পরিষ্কার করে রাখি। শ্মশান থেকে ফেরবার পথেই তার ওয়ারিশকে চেক দিয়ে দিই। ইউ ইণ্ডিয়ানস্, এম্পারার অব্ আইড্‌ল্‌নেস, মানে কুঁড়ের বাদশা, পানের পিক ফেলতে তোমাদের ছয়মাস লাগে, তোমরা জীবনেও আমাদের কোম্পানীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। নেভার, নেভার, নেভার।

তোরা ত জানিস ব্রজরাজ কারফর্মার ন্যাশন্যাল স্পিরিটে যদি কেউ ঘা দেয় তাহলে সে ফিউরিয়াস হয়ে ওঠে। সাহেব ব্যাটার কথা শুনে আমি তাই মরীয়া হয়ে উঠলাম। নতুন সিস্টেম ইনট্রোডিউস্ করে এফিসিয়েন্সি আমরা একশগুণ বাড়িয়ে ফেললাম। ফল মিলল হাতে হাতে।

উইদিন সিক্স মান্থ সাড়ে সাত লাখ টাকার বিজিনেস দিলাম।

খবর পেয়ে সেই স্কচ্ সাহেবের চোখ কপালে উঠল। একদিন আমাকে ডেকে বললে, বাবু তুমি যে মিরাকল্ করলে। তোমার সিক্রেটটা কি বলবে, অফকোর্স যদি আপত্তি না থাকে।

হেসে বললুম, সাহেব, আপত্তির আর কি আছে। তোমার কোম্পানীর মূলমন্ত্র যা, আমার কোম্পানীরও তাই। এফিসিয়েন্সি।

তবে এফিসিয়েন্সি তোমাদের থেকে আমাদের হাজারগুণ বেশি। এ ত স্কচ ফার্ম নয়, বাঙ্গালী ফার্ম।

সাহেব বলল, হোয়াট! কি বললে?

আমি বললুম, ঠিকই বলেছি। একদিন এসে দেখেই যাও না।

সাহেবের বাচ্চা ত, এল একদিন। কাজকর্ম দেখে সত্যিই খুশি হল খুব। আমার ঘরে জানলার ধারে বসে দুজনে কফি খেতে খেতে গল্প করছি, এমন সময় পাঁচতলার ছাত থেকে আমাদের এক পলিসি হোল্ডার পা ফস্কে পড়ে গেল। প্রিমিয়াম জমা দিতে এসেছিল। রাস্তা থেকে গেল গেল রব উঠল। লোকটা পাঁচ হাজার টাকার বীমা করেছিল। আমার ঘর তেতলায়। আমার জানালার পাশ দিয়ে পড়বার সময় তার হাতের মুঠোয় পুরো পাওনার বেয়ারার চেক্‌খানা গুঁজে দিলাম। পুরো টাকা হাতে নিয়েই সে আছাড় খেয়ে মরল।

সাহেবের চোখ ছানাবড়া। অনেকক্ষণ গুম মেরে বসে রইল। তারপর উঠে আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললে, চোখে না দেখলে ভাবতাম গুল ঝাড়ছ। তোমাদের সঙ্গে আমরা পারব না। আমাদের ব্যবসাটা গুটোতেই হবে দেখছি।

তিন

সুনীত ঘোষ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, মশাই আমি নিজের কানে শুনেছি। যা শুনেছি তা মিথ্যে বলি কি করে?

সুনীল বোস বললে, যা তা একটা বললেই ত হল না মশাই। মিনিষ্টার যতই হয়ে হন না কেন, এরকম কথা কি বলতে পারেন?

যত্নদা দেখলেন বড্ড গরম চড়ছে। ঠাণ্ডা করবার জন্য বললেন, এক্‌জাক্ট কি কথাটা বলেছিলেন তিনি, বলতে পারেন?

সুনীত ঘোষ বললে, কেন পারব না মশাই। প্যারেড ট্যারেড হয়ে গেলে পুলিশমন্ত্রী পুলিশ-কুকুর দুটোর গলায় রাষ্ট্রপতির দেওয়া বকলস বেঁধে দিলেন। তারপর বুক ফুলিয়ে ভাষণ দিলেন, এই যে পুলিশ কুকুর দুটি, এদের নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং শৃঙ্খলাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে। এরা সমগ্র পুলিশ বাহিনীরই গৌরব। একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আশা করি এদের সহকর্মিরা এদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে বাহিনীর সুনাম, গৌরব ও ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখবেন।

সুনীত গড়গড় করে এক নিশ্বাসে ভাষণটি আউড়ে টেবিলে চাপড় মেরে বললে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইট।

কিছু অন্যায় বলেন নি। বৃটিশ আমলে ক্যালকাটা পুলিশে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে বাছা বাছা লোক আনা হত টেররিষ্টদের ধরবার জন্য। তারা ত ছদ্মবেশী টেরিয়ার কুকুরই।

কথাটা শুনে চমকে আমরা পিছন ফিরে চেয়ে দেখি, ব্রজদা। সুনীল বোসকে একটু সরিয়ে দিয়ে এসে বসলেন।

তারপর নিজের কথারই জের টেনে বলতে সুরু করলেন, জানিস ত, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ হচ্ছে ওয়ার্লড্ চ্যাম্পিয়ান পুলিশ। ছদ্মবেশ ধরতে দারুণ ওস্তাদ। ওদের ধারে কাছে এ বিষয়ে দাঁড়াতে পারে. এমন কাউকে ত আজ পর্য্যন্ত দেখিনি। এমনিতে বিলিতি সাহেব, কিন্তু মুটে মজুর, বাঙ্গালী বিহারী, এমন কি কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত অনায়াসে সাজতে পারত তারা। আসল কি নকল ধরাই দুষ্কর হ'ত। মানে ওসব ছিল বিলিতি মেকার কিনা। ওদের কেরদানিই ছিল আলাদা বুঝলি। তাই ত বলছি দেশি পুলিশকে সরকার যদি সত্যিই কুকুরের দোসর করে তুলতে পারেন, তবে ত কাজের মত কাজ হয় একটা।

সুনীত ব্রজদার কথা শুনে ঘাবড়ে গেল। এতক্ষণ তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল। এবার মিন মিন করে বললে, মানুষ কি কুকুর হতে পারে?

ব্রজদা বললেন, উপযুক্ত ট্রেণিং পেলেই পারে। কিন্তু কথাটা উঠল কেন।

বিনীতভাবে বললুম, পুলিশ প্যারেড্ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—-

ব্রজদা বাধা দিয়ে বললেন, প্যারেড! আজকাল কি আর প্যারেড হয়। ছ্যাঃ। দেখলে মনে হয় যেন মর্ণিং ওয়াক হচ্ছে। হ্যাঁ প্যারেড্ হ'ত বৃটিশ আমলে। সেবার সেই প্যারেড নিয়েই

ত লর্ড কিচেনারের সঙ্গে আমার বেধে গিয়েছিল একচোট। লর্ডের পো'র থোতামুখ ভোঁতা করে দিয়েছিলুম। তা জানিস?

সবাই হাঁ করে ব্রজদার মুখপানে চেয়ে রইলুম!

তবে শোন, ব্রজদা সুরু করলেন ঃ

ফার্ষ্ট ওয়ার্লড্ ওয়ার তখন খুব জমে উঠেছে। জার্মাণদের হাতে প্যাঁদানি খেয়ে খেয়ে বৃটিশদের চোখে এন্তার সরষের ফুল ফুটছে। সেই সময় লর্ড কিচেনার ইণ্ডিয়াতে এলেন। লর্ড কিচেনার তখন মেসোপটেমিয়ায় মিত্র-শক্তির কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ। দারুণ পোজিশান। তার উপর ভাইস্‌রয়ের বৌয়ের ক্লোজ ফ্রেণ্ডের বর। বুঝে দ্যাখ কিচেনারের রিসেপশনটা দিল্লিতে কেমন হল। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ এলেও অত ঘটা হয়েছিল কিনা তা আমি বলতে পারব না। তবে আমার লাইফেও আমি ওরকম কম দেখেছি।

ইণ্ডিয়ার ক্যাপিট্যাল তখন নিউ দিল্লিতে উঠে গেছে। খুব বেশি দিন ত হয়নি তাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কথায় কথায় জলুস ছোটাচ্ছে। সে যে কি রোয়াব তোরা আইডিয়া করতে পারবি নে।

যা হোক, নিউ ইয়ারে লর্ড কিচেনারের অনারে বিরাট এক প্যারেডের ব্যবস্থা হল। কিচেনার নিজেই স্যালুট নেবেন। ভাইসরয়ের এডিকং-এর আমি আবার ছিলুম পার্সন্যাল ফ্রেণ্ড। নেমন্তন্ন পেয়ে না গিয়ে আর পারলুম না। ইম্পিরিয়াল মেলের টিকিট অব্দি পাঠিয়ে দিয়েছিল কিনা। ইম্পিরিয়াল মেল জানিস ত? বড়লাটের নিজের গাড়ি। সেই মেলে ফার্ষ্ট ক্লাস ছাড়া আর কোন কেলাসই থাকত না।

প্যারেডের দিন আমরা সব ইম্পিরিয়াল গ্যালারীতে বসলুম। প্রথমে ভাইসরয়, পাশে তার বউ, তার পাশে এডিকং, তার

পাশে আমি, তারপর পরপর নানা হোমরাচোমরা বসল। রাজা মহারাজারা সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে সব ঝেঁটিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা আমাদের পিছনে বসেছে। আর সব ব্যাটা আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। কেন, বুঝেছিস ত? আমার প্রেস্টিজ মাপছে।

বিউটিফুল প্যারেড। ইণ্ডিয়ানদের হাতে রাখবার জন্য আরম্ভ করলে জয়সলমীর রিশালা দিয়ে। ওটা হল উট বাহিনী। ডেজার্ট ফাইটে খুব নাম কিনেছিল। তারপর রাজপুত ল্যান্সার। অশ্বারোহী বাহিনী। তারপর ফিফ্‌থ ক্যাভাল্‌রি। পুরো একটার পর একটা কোম্পানী পাস করছে আর হাততালির চোটে দিল্লির আকাশ ফেটে যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছে। শিখ রেজিমেন্ট, মারাঠা ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি চলে গেল। কি তেজ। তারপর গেল বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ন। নামেই বেঙ্গল। বাঙ্গালী একটাও নেই। অপমানে আমার মুখ কালো হয়ে গেল। ন্যাশান্যাল ইন্‌সাল্ট ত। ওদের ধারণা বাঙ্গালী যুদ্ধ করতে জানে না। মানে কন্‌স্‌পিরেসি করে কথাটা রটিয়েছে আর কি। ঠিক মত ব্যাকিং পেলে বাঙ্গালীরা যে কী করতে পারত, সে আইডিয়া ত আর বৃটিশদের ছিল না। আখেরে তাই ম'ল। যেদিন থেকে ইংরেজরা ব্যাকিং দেওয়া বন্ধ করল, তার পরদিন থেকেই বাঙ্গালী স্বদেশিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাদের সঙ্গে চালাকি!

প্রায় দুঘণ্টা প্যারেড্ চলল। আমি বলেই অপমানটা স্পোর্টসম্যানের মত গিলে প্যারেড দেখতে লাগলুম। এবার আসছে স্কটিশ হাইল্যাণ্ডার। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বেষ্ট রেজিমেন্ট নাকি এইটেই। চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল দর্শকদের মধ্যে। কারণ এটা হল কিচেনারের সব থেকে পেয়ারের রেজিমেন্ট। লেফ্‌ট্ রাইট্ করতে করতে এগিয়ে আসছে ওরা। হঠাৎ আমার

কানে বেসুরো বাজল। কি ব্যাপার? উৎকর্ণ হয়ে উঠলুম। নাঃ ঠিক তেমন করে পা মিলছে না। খুব সূক্ষ্মভাবে ছন্দপতন ঘটছে কোথাও? ব্রজরাজ কারফর্মার কানকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। জাতীয় বাহিনীর হাজার হাজার ছেলেকে এক সঙ্গে প্যারেড করিয়েছি। আমার কাছে ত পেঁয়াজি চলবে না!

এডিকংএর কানে কানে বললুম, কি কর্ণেল সাহেব, এই তোমাদের বেষ্ট রেজিমেন্ট। প্যারেডে যাদের পা মেলে না তারা হল বেষ্ট! ছোঃ। কর্ণেল সাহেব আমার আচমকা বিদ্রূপে এমন ঘাবড়ে গেল যে স্থানকাল ভুলে প্রায় উচ্চকণ্ঠেই বলে উঠল, পা মিলছে না। হোয়াট ডু ইউ মিন?

ভাইসরয়ের বউয়ের কানে সে কথা উঠল। তিনি বললেন, কি, কার পা মিলছে না। কর্ণেল সাহেব থতমত খেয়ে বললে, ও কিছু নয় ইওর অনার। ব্রজদা বলছিল—

ভাইসরয়-গিন্নি লর্ডের মেয়ে। অত সহজে ভোলবার ভবি নয়। আমাকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, ব্রজ কাম হিয়ার। আমার পাশে এসে বস। কিসের থেকে ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়ে গেল। বড়লাটের বউ লাটস্য লাট, তাঁর আদেশ ত অমান্য করা যায় না। বসলুম পাশে গিয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াট ব্রজ, কি বলছিলে। আমি ভয় খাব কেন, আমি কি সরকারের সারভেন্ট? বললুম, ম্যাডাম, প্যারেডে এদের ঠিক মত পা মিলছে না। বেসুরো ষ্টেপ পড়ছে। কোথাও গড়বড় কিছু হচ্ছে।

ভাইসরয়-গিন্নি বললেন, ইজ দ্যাট সো।

বললুম, ইয়েস ম্যাডাম। ভুল যদি বলি তবে এখেনেই আমাকে ফাঁসিতে লটকে দিও। দিস্ ইজ মাই চ্যালেঞ্জ।

ভাইসরয়-গিন্নির চোখমুখ লাল হয়ে উঠল প্রথমে। পরক্ষণেই বিব্রত হয়ে উঠলেন। আমার হাত দুটো চেপে ধরে রিকোয়েষ্ট

করলেন, ব্রজ প্লিজ, একথা আউট কর না কখনও। কিচেনার আমার গেষ্ট। বড় লজ্জায় পড়বে বেচারা।

কি আর করি, কথা দিলুম। এদিকে আরেক কাণ্ড হয়ে গেল। স্কটিশ হাইল্যাণ্ডার রেজিমেণ্ট মার্চ পাস্ট করে বেরিয়ে গেল কিন্তু কোন হাততালি পড়ল না। কারণ এতক্ষণ ধরে প্রথম হাততালিটা সুরু হচ্ছিল ভাইসরয়ের গিন্নির কাছ থেকে। তারপর আর সবাই তাঁকে ফলো করছিল। কিন্তু এবারে আমার হাত তুটো ভাইসরয় গিন্নি বিহ্বল হয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন বলে তাঁর হাত তুটো এনগেজড হয়ে পড়ল কিনা, তালি বাজাবার ফুরসৎ পেলেন না। তাই কেউই আর তালি বাজাতে পারল না। সত্যি বৃটিশ এটিকেট একটা দেখবার মত জিনিস। এর আর জুড়ি নেই।

এদিকে আসল জায়গায় হাততালি পড়ল না দেখে ভাইস্রয় বোমকে গেলেন, রেজিমেণ্টের মুখ কালো আর লর্ড কিচেনার খচে লাল হয়ে উঠলেন। ভাইসরয়-গিন্নি যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তখন মহা অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন। ভাইসরয়েতে আর তাঁতে কিছুক্ষণ ধরে কি যেন ফিস্‌ফিস্ হল, ভাইসরয় আমার দিকে একবার চাইলেন। এর মধ্যেই প্যারেড শেষ হল।

আমরা উঠব উঠব করছি এমন সময় দেখলুম ভাইসরয়েতে আর লর্ড কিচেনারেতে আবার কি যেন ফিস্‌ফিস্ হচ্ছে। ভাইসরয় আর কিচেনার তুজনেই কিছুক্ষণ আমার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। কিচেনার তাঁর সরু গোঁফের ডগা ঠোঁটের কোণ দিয়ে চাটতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ ইসারা করে কর্ণেল সাহেবকে ডাকলেন। কর্ণেল সাহেবের মুখ দেখে মনে হল তাঁর বারটা বেজে গেছে। তুজনে আবার কিছুক্ষণ ফিস্‌ফিস্ হল। তারপর আমার ডাক পড়ল।



গোঁফের ডগা ঠোঁটের কোন দিয়ে চাটতে লাগলেন।

লর্ড কিচেনারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি আমাকে জেরা করতে শুরু করলেন। ব্যাটার জেরার চোটে প্রাণ আমার যায় আর কি।

লর্ড কিচেনার ঃ ইয়ংম্যান তুমি বলেছ প্যারেডে পা মেলেনি।

আমি ঃ ইয়েস স্যার।

লর্ড কিচেনার ঃ প্যারেডের তুমি কি বোঝ ?

এইবার আমার বড় রাগ হয়ে গেল বুঝলি, বললুম, দেখ সাহেব, আমি হচ্ছি বেঙ্গল টকেটিভ ফোর্সের অনারারি জি-ও সি। আমার হেডকোয়ার্টার বাগবাজারের রোয়াক। দুনিয়ায় এমন বিদ্যে নেই যা আমার অজানা। এখানে চালাকি মারতে এস না। তোমার ঐ রেজিমেন্টের মত পাঁচটা রেজিমেন্টকে ডেলি দশবার প্যারেড শেখাতে পারি। শিখিয়েও থাকি। ভুল বলেছি কি ঠিক

বলেছি আগে যাচাই করে ছাখ তারপর আমাকে চ্যালেঞ্জ করো। গডেস্ দুর্গার প্রোসেসনও আমাকে লীড করতে হয়। স্টেপিং-এর কারচুপি ধরতে আমার বেশি সময় লাগে না।

লর্ড কিচেনার বললেন, হুঁ লেট মি সি। তারপর ভাইসরয়, ভাইসরয়-গিন্নি, আমাকে আর কর্ণেলকে নিয়ে লর্ড কিচেনার একখানা গাড়িতে উঠলেন। আমরা সটান চললাম স্কটিশ হাই-ল্যাণ্ডারদের ছাউনিতে।

গোটা রেজিমেন্ট তখন মনমরা হয়ে বিশ্রাম নেবার উপক্রম করছিল। আমাদের দেখে ওদের ত প্রাণ উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সব খটাস খটাস অ্যাটেনসন হয়ে দাঁড়াল। কিচেনার হুকুম দিলেন প্যারেড করতে। ওরা মার্চ করে ওদিক থেকে ফিরে এসে আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। সবাই একে একে মার্চ করে বেরিয়ে গেল।

কিচেনার আমার উপর খুব চটে উঠলেন। বললেন, ইট ইজ অলরাইট।

আমি মুচকি হেসে বললুম, লর্ড সাহেব, নো অলরাইট। স্টেপিং-এর গোলমাল আছে।

লর্ড কিচেনার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ইউ ডার্টি বিষ্ট, দেখাও, বের কর কোথায় ডিফেক্ট।

আমি তখন সিঙ্গল ফাইল প্যারেডের পরামর্শ দিলুম। তারপর চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইলুম ভাইসরয়-গিন্নির পাশে। একজনের পর একজন আমাদের সামনে দিয়ে লেফট রাইট করতে করতে বেরিয়ে যেতে লাগল। তারপর যেই আমার কানে বেসুরো লাগা অমনি বললুম হল্ট। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওরা থেমে পড়ল।

সামনের লোকটাকে ফাইল থেকে বের করে আনলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বাঁ পায়ে কি হয়েছে? সে ত হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অর্ডার দিলুম, জুতো খোল। সে ভয়ে ভয়ে জুতো খুলল। বললুম, মোজা খোল। সে ব্যাটা লেডির সামনে কিছুতেই মোজা খুলবে না। তখন ধমক মারলুম, বল, তোমার গোড়ালিতে কি লেগে আছে। সবাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে



বললে, স্যর চুইং গাম্

আছেন। বুঝতে পারছি কারোর মাথাতেই কিছু ঢুকছে না। কিন্তু আমি ব্রজ। আমি কি অত সহজে ছাড়ি।

আবার ধমক মারলুম। গোড়ালিতে কি আটকে আছে।

ব্যাটা এতক্ষণে পথে এল। বললে, স্যার চুইং গাম। কি করে যেন মোজার ভিতর ঢুকে গেছে। স্বস্তির সঙ্গে পা ফেলতে পারছি নে।

জাস্ট সি, বলে লর্ড কিচেনারের দিকে চাইতেই তিনি আমার হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, অবিশ্বাস্য, অভাবনীয় অকল্পনীয়—ব্রজ ব্রজদা ইউ আর গ্রেট। তারপর কানের কাছে মুখ আনতেই আমি বললুম, বুঝেছি স্যার, কাউকে বলব না। এর কথা তাকে বলা, আমাদের বাঙ্গালীদের তেমন স্বভাব নয়।

ভাইসরয় আর তাঁর গিন্নি বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ ব্রজ।

চার

সুনীত ঘোষ বললে, থামুন মশাই, আপনি ত কনফার্মড্ ব্যাচেলর, আপনার মুখ থেকে মেয়েদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য শুনতে চাইনে। বিয়ে-থা আগে করুন—

বাধা দিয়ে সুনীল বোস বললে, দুদিনের বৈরেগী হয়ে ভাই ভাতকে মহাপ্রসাদ বলতে শুরু করেছ। তোমাকে আর বলব কি। বিয়ে করলেই যদি মেয়ে-চেনার সাবজেক্টে অনার্স পাওয়া যেত, তাহলে ত দুনিয়াটা বেহেস্ত হয়ে উঠত। মেয়েদের চেনা কি অতই সহজ।

চিনবেন কি করে? যদুদা অমায়িক হেসে মন্তব্য করলেন, ওরা স্বরূপে কি কখনও ধরা দেন? সব সময় ছদ্মরূপে বিরাজ করছেন। ঐজন্যই তো মহাজন ব্যক্তিরা ওঁদের নাম দিয়েছেন বিচিত্ররূপিণী। মেয়েদের ছদ্মবেশ উন্মোচন করা—

শিবেরও অসাধ্য, মানুষ ত কোন ছার। ব্রজদা গম্ভীরভাবে রায় দিলেন।

বললেন, শুনলে হয়ত বিশ্বাস করবিনে, তিন সপ্তাহ এক তাঁবুতে দিনরাত কাটিয়েও তিন তিনটে জাঁদরেল লোক আমরা টেরই পাইনি, যে আমাদের সঙ্গে রয়েছে ওয়ার্লড্ ফেমাস এক

মহিলাও। বৃটিশ সরকার যাকে মৃত কিংবা জীবিত অবস্থায় ধরে দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার গিনি বকশিশ করবে বলে ডিক্লেয়ার করেছিল।

হাঁ হয়ে যাবার মতই অভিজ্ঞতা বটে। ব্রজদা থামলেন। একটু পরে বললেন, গল্প-কথা নয়, একেবারে ট্রু ফ্যাক্ট। স্বয়ং আমি তার সাক্ষী। মাতাহারির নাম শুনেছিস ত? ফেমাস জার্মাণ স্পাই? আমরা সেই মাতাহারির সঙ্গে তিন সপ্তাহ এক নাগাড়ে এক মিলিটারি ক্যাম্পে বাস করেছি। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি যে সেও আমাদের সঙ্গেই ঘুরছে ফিরছে আসছে যাচ্ছে, এমন কি কখনো কখনো একই বিছানায় আমাদের সঙ্গে শুচ্ছেও। আর হোল মিলিটারি সিক্রেট আউট করে দিচ্ছে।

তবে হাঁা, মেয়ের মত মেয়ে বটে মাতাহারি। ঐ যে তোরা যা বললি, বিচিত্ররূপিণী, এ একেবারে তাদেরই মহারানী। আমি ত আমার লাইফে আর সেকেণ্ড মাতাহারি দেখলুম না। যেমন চোখ-কানা-করা রূপ আর তেমনি ক্ষুরধার তার বুদ্ধি। অমন ঝুঁদে যে এলায়েড্ ফোর্স তাকে একেবারে নাকানি চোবানি খাইয়ে ছেড়েছে। একদিকে মাতাহারি একা আর অন্যধারে গোটা এলায়েড্ ইনটেলিজেন্স। তাও ওকে এঁটে উঠতে পারেনি। বার বার এদের টপ সিক্রেট আউট করে দিয়েছে। এলায়েড্ ফোর্স যতবার জার্মানদের মোক্ষম মার দেবার প্ল্যান এঁটেছে ততবারই দেখা গেছে সে সব প্ল্যান আগেভাগে জার্মানদের হাতে গিয়ে পড়েছে। আর জার্মানরা রাম-প্যাঁদান পেঁদিয়েছে এদের।

বৃটিশরা বুঝতে পেরেছিল তাদের স্ট্র্যাটেজিক কোনো জায়গায় জার্মান স্পাই এসে থানা গেড়েছে। কিন্তু কে যে সে স্পাই, কোথায় তার আস্তানা, কি কৌশলে সিক্রেট আউট করছে, সেটা

আর কিছুতেই ধরতে পারে নি। পারতও না, যদি এই শর্মা সে কাজটা না করে দিত।

বলেই ব্রজদা নিজের বুকে আঙ্গুল দেখালেন।

ব্রজদা খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর ফোঁস করে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, সে কি আজকের কথা। বোধ হয় নাইনটিন সেভেনটিন-টেভেনটিন হবে। ফার্স্ট গ্রেট্‌ওয়ার তখন পুরোদমে চলেছে। খুঁটিনাটি সব মনেও নেই ভাল করে। বৃটিশ মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের পুরনো রেকর্ড হাতড়ালে দেখতে পারি 'অপারেশান ব্রজদা' বলে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাতে আছে। আর যদি লর্ড কিচেনারের অরিজিন্যাল ডায়েরীখানা পাস, তাহলে ত কথাই নেই। পুরো হিস্ট্রিটাই তাতে পাবি। তবে এখন তার মোটামুটি একটা আইডিয়া দিতে পারি।

শোন তাহলে ঃ

আই, এফ, এ, শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইন্যালে মোহনবাগানের হয়ে খেলে বাড়ি ফিরছিলুম। আমার তেমন খেলবার ইচ্ছে ছিল না এবার। বাঁ-হাঁটুর মালাটা ভেঙ্গে একদম চুরমার হয়ে গিয়েছিল কি না। হাঁটতেও কষ্ট হত। কিন্তু গোরাদের সঙ্গে খেলা ত, রিস্‌ক্ নেওয়া যায় না, গোষ্ঠ একা সাহস পায় না। বার বার করে বললে, ব্রজদা তুমি না খেললে এবারে গেলুম। তাই রাজী হয়েছিলাম। হেরে গেলে ত ন্যাশনাল প্রেস্টিজটি একেবারে ডকে উঠবে, বুঝলি নে। তাছাড়া সন্তোষের মহারাজার পার্সন্যাল রিকোয়েস্ট, কিছুতেই না করতে পারলুম না। গোটা চারেক নিক্যাপ পরে মাঠে নামলুম। গোষ্ঠ ব্যাক। আমি রাইট ইন। গোষ্ঠ লাইন থেকে সট্ ঝেড়ে বল কর্ণারে পাঠায় আর আমি সেই

ডান দিকের বল বাঁ পা দিয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে কোনাকুনি নিচু সটে নেট্ করি। হাফ টাইমের আগেই পরপর চার বার। ওদের গোলি আমার এই নতুন কৌশল ধরে ফেলার আগেই দেখা গেল, ফোর টু নিল।

যাহোক, বাড়ি ফিরতেই এক চিঠি পেলুম। ছোটলাটের চিঠি। পত্রপাঠ এসে দেখা করুন। জরুরি। বড্ড বিরক্ত হলাম। ম্যাচ্ খেলে টায়ার্ড হয়ে পড়েছি, এখন কোথায় একটু রেস্ট নেব, না এই ঝামেলা। কিন্তু লাট মানুষ, দেখা করতে চেয়েছে, কি আর করা, সেইভাবেই বেরিয়ে গেলুম।

রাস্তায় নামতেই কে যেন পিছন থেকে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, রাস্তার মোড়ে কালো গাড়ি আপনার জন্যে ওয়েট্ করছে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে চাইলাম, কিন্তু কাউকে আর দেখলুম না। ব্যাপারটাতে একটা রহস্যের গন্ধ যেন ছড়িয়ে পড়ল। ভাবলুম, ব্যাপারটা কি? এর মধ্যে কারো কারসাজি আছে না কি? না কি আমাকে নিয়ে কেউ মজা মারছে?

তোরা আজকালকার জেনারেশান ত, কি করতিস কে জানে? কিন্তু আমি ব্রজরাজ কারফর্মা, কোনো জিনিসে হাত দিলে তার শেষ না দেখে ছাড়িনে। ভারত মাতার তৈরী ছেলে, পিছু হটতে জানি নে! গট্‌গট করে গাড়ীতে গিয়ে চাপলুম।

শেষ পর্য্যন্ত লাট সাহেবের বাড়িতেই গেলুম। লাট সাহেব নিজে এসে আমাকে আদর আপ্যায়ন করলেন। অসময়ে ডিস্টার্ব করার জন্য অ্যাপলজিও চাইলেন। তারপর খাস কামরায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, মিঃ কারফর্মা, ব্যাপারটা টপ্ সিক্রেট। শুধু আমি জানি আর আপনি জানবেন। তাই এরকম গোপনীয়তা অবলম্বন করেছি। তবে ব্যাপারটা শুনুন। আপনাকে আজই ফ্রান্সে রওনা দিতে হবে। এখুনি। লর্ড কিচেনারের হেড

কোয়ার্টার্সে। তিনিই আপনাকে তলব করেছেন। এই দেখুন তাঁর চিঠি। লাট সাহেব ড্রয়ার থেকে সীল করা একখানা খাম আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। দেখলুম ডিপ্লোমেটিক কভারের চিঠি। চিঠিখানা খুলে পড়লুম। মিলিটারী আদমি ত। বেশি ধানাই পানাই নেই। লর্ড কিচেনার সোজাসুজিই লিখেছেন ঃ মাই ডিয়ার ব্রজদা, আমি তোমার সাহায্য চাই। ভেরি আর্জেন্ট। অবশ্য সাধারণ বাঙ্গালীর মতো গুলিগোলা খেয়ে মরতে যদি ভয় না পাও, তাহলেই এস। প্রয়োজনের কথা সাক্ষাতে বলব। ইওরস্ লাভলি। কিচু।

ঐ যে খোঁচাটা দিলে কিচেনার, মরতে যদি ভয় না পাও, ওতেই কাজ হল। আমি রাজী হয়ে গেলুম। না হলে এমনি প্লেনলি যদি বলত তাহলে যেতুম কি না সন্দেহ। কারণ আমাদের সেকশনের বড়বাবু আমার পিছনে খুব লেগেছিল তখন। উইদাউট নোটিশে কামাই করলে শালা চাকরিই হয়ত খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু জাতের গায়ে খোঁচা মেরেছে, এ চ্যালেঞ্জ তোদের ব্রজদা অ্যাক্সেপ্ট না করে পারে! ভাবলুম যায় চাকরি যাবে, তাবলে জাতের মুখে চুনকালি লেপতে কাউকে দেব না। দেশের জন্য যদি দরকার হয়, চাকরি খুইয়ে না হয় শহীদই হব।

লাট সাহেবকে বললুম, অলরাইট, যাব আমি। তবে দুটো কোয়েশ্চেন আছে।

লাট সাহেব বললেন, বলুন, আপনার কি জানবার আছে?

বললুম, এক নম্বর কথা, আপিসে একটা ছুটির দরখাস্ত করতে চাই। নইলে মাইনে কাটবে, বড়বাবুটি বেশ টেটিয়া আছে। চাই কি চাকরিও গন্ হতে পারে। আর দু নম্বর কথা, কবে যেতে হবে, কি করে যাব?

লাট সাহেব আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবই আগে দিলেন,

এখনই যেতে হবে, জাস্ট নাও। কি করে যাবেন, সেজন্য আপনি ভাববেন না। বৃটিশ ইম্পিরিয়াল গভর্নমেন্ট সে ব্যবস্থা করবেন। এবার প্রথম প্রশ্নে আসি। আপনি একখানা ছুটির দরখাস্ত লিখে আমার হাতে দিয়ে যান। আমি সেটা ম্যানেজ করব।

ব্যস হয়ে গেল ফয়সালা। এক সপ্তাহের মধ্যেই সুস্থ শরীরে লর্ড কিচেনারের হেড কোয়াটারে পৌঁছে গেলুম। কি পারফেক্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট। একেবারে তাক লেগে যায়। সাবমেরিনে করে আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে উঠলুম আর নামলুম ক্যালেতে। কোথায় গঙ্গা আর কোথায় ইংলিশ চ্যানেল। বিজ্ঞানে কি না করতে পারে।

লর্ড কিচেনারের তাঁবুতে পৌঁছতেই তিনি বেরিয়ে এসে আমার দুহাত জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন, ব্রজদা, তুমি আমায় বাঁচালে। জানতুম তুমি খবর পেলে আসবেই। তবু তোমায় না দেখা পর্যন্ত অশান্তিতে ছিলুম।

সেই রাত্রেই ডিনারের টেবিলে তিনি ফরাসী স্থলবাহিনীর কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ জেনারেল ফুসফুসিয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বললেন, হিয়ার ইজ মাই ফ্রেণ্ড ব্রজদা। কামিং ফ্রম ক্যালকাটা।

জেনারেল ফুসফুসিয়ে আহ্লাদে গদগদ হয়ে ফরাসী ভাষায় আমাকে অভিনন্দন জানালেন।

বললেন, মসিয় ব্রজদা, আমরা ফরাসীরা ইউরোপের বাঙ্গালী বলে গর্ব অনুভব করি। একটা হিস্ট্রিতে পড়েছি নাপলিয়ঁর (তোরা যাকে গাড়লের মতো নেপোলিয়ান বলিস) রক্তেও বাঙ্গালীত্ব ছিল।

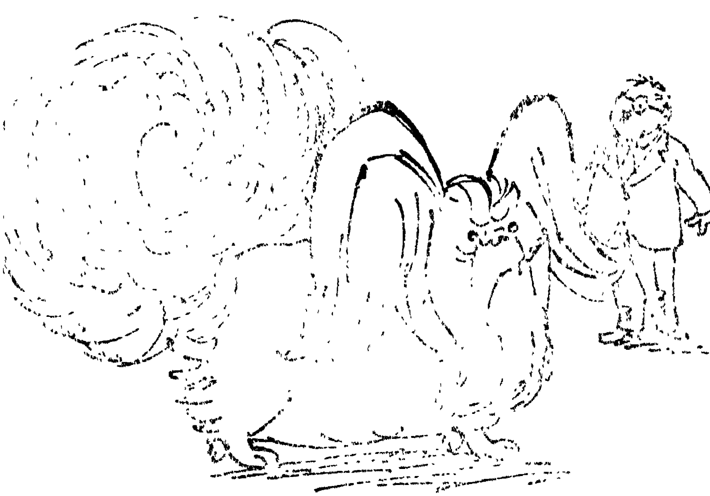
জেনারেলের ভুলটা শুধরে দিয়ে বললাম, বাঙ্গালীত্ব নয়, বাঙ্গালত্ব ছিল। বাঙ্গালী আর বাঙ্গাল দুটো সেপারেট স্পিসিস্ কি না। আমার মধ্যেও বাঙ্গালত্বই বেশি। আসলে আমরা বিক্রমপুরের অরিজিন। ক্যালকাটাতে ডোমিসাইলড্।

এমন সময় কোত্থেকে অপূর্ব সুন্দরী এক মাদি কুকুর এসে কুই-কুই করে আমার বাঁ হাতটা চেটে দিলে। কুকুরটার আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। তাই চমকে উঠলাম। জেনারেল ফসফুসিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে বার বার তার কুকুরটার বেয়াদবির জন্য মার্জনা চাইতে লাগলেন।

ধমকে বললেন, জেন জেন, ও-ঘরে যাও।

কুকুরটা চলে গেল। বাঁ হাতটা তুলে দেখি একটা লাল ছোপ লেগে গেছে। অনেকটা আলতার ছোপের মতো।

জেনারেল বললেন, ও কিছু নয়। জেনের লিপস্টিক খাবার অভ্যাস আছে। সোসাইটি বিচ্ কিনা। এটা ওর অদ্ভুত



ফরাসী কুকুরও লিপস্টিক মাখে

অভ্যাস। আমার জামা কাপড় প্রায়ই নষ্ট হয় ওর জন্য। আই অ্যাম সরি।

জেনারেলের কৈফিয়ৎ শুনে হাসি পেল। ফরাসী কুকুরও লিপস্টিক মাখে! শা—র জাতই আলাদা।

ডিনারের পর আসল কথা শুরু হল। ওরা দুজনে যা বিবরণ দিলেন তার অনেক কথাই টপ্‌ সিক্রেট। এমন কি এখনও তোদের তা বলতে পারব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, যে জার্মান স্পাইরা এই কম্যাণ্ডের সব সিক্রেট আউট করে দিচ্ছে। ফলে গভর্ণমেণ্টের কাছে লর্ড কিচেনার এবং জেনারেল ফুসফুসিয়ে খুবই বেইজ্জত হচ্ছেন। আর কিছুদিন এমনিভাবে চললে ওদের দুজনের অবস্থা যে কি দাঁড়াবে 'নো বডি ক্যান সে'। লর্ড কিচেনার জানালেন, ওদের তরফের স্পাইরা যে যে খবর এনেছে তাতে জানা গেছে ক্যাপেটেন থ্রি এক্‌স্‌ বলে একজন স্পাই এদের সব খবর ফাঁস করে দিচ্ছে। তার পরিচয়ও জানা গেছে। ক্যাপটেন থ্রি এক্‌স্‌ যার নাম, তারই আর এক নাম মাতাহারি। পরমা সুন্দরী এক মেয়ে। ছদ্মবেশে সর্বদা থাকে বলে কেউ তাকে স্বরূপে এ পর্যন্ত দেখেনি। (ঐ যে তোরা যাকে বিচিত্ররূপিণী বলিস, তাই আর কি!) সব রকম ছদ্মবেশ ধরতে সে নিদারুণ ওস্তাদ। আরও জানা গেছে সেই এই ক্যাম্পেই আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কেমন করে এ সব খবর বাইরে পাঠাচ্ছে কেউ তা ধরতে পারেনি।

তোমার কথাই ধর না, লর্ড কিচেনার বললেন, তুমি যে আসবে, সে কথা শুধু আমি জানি আর জেনারেল ফুসফুসিয়ে জানেন। আর ত কেউ জানে না, জানার কথাও নয় কারো। তবুও এ খবর ফাঁস হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। ওরা যে কি সাংঘাতিক রকমের অ্যাক্‌টিভ্‌ বুঝে দ্যাখ। এখন, ব্রজদা, মাতাহারির

হাত থেকে তোমাকে আমাদের বাঁচাতে হবে। ওকে খুঁজে বের কর। জীবিত অথবা মৃত ধরে দিতে পারলে বৃটিশ ক্রাউন পঞ্চাশ হাজার গিনি পুরস্কার দেবেন।

ভাবনায় পড়লুম। ছোটলাট কনফিডেন্সিয়াল চিঠিতে লিখেছেন তিন হপ্তার বেশি কোম্পানী আমাকে এক দিনও ছুটি দেবে না।

তিন সপ্তাহ প্রায় কেটে যায়-যায়। আফিসের ছুটিও প্রায় ফুরিয়ে এল। কিন্তু মাতাহারির কোনো ট্রেসই করতে পারলুম না। শালা ইজ্জত ঢিলে হয়ে যাবার জো হল। লর্ড কিচেনার খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ফরাসীরা ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল। আমার রাতের ঘুম নষ্ট হল।

সেদিন গভীর রাত্রে আকাশ-পাতাল ভাবছি শুয়ে শুয়ে। হঠাৎ দেখি জেন নতুন একটা লিপস্টিক ঠোঁটে করে জেনারেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জেনের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। আমি ডাকলেই ও ছুটে আমার কোলে এসে বসে। গাল চেটে দেয়। রাত্রে কখনও কখনও আমার কোলের মধ্যে শুয়েও থাকে। জেনের সঙ্গ পেলে আমার মধ্যে কেমন একটা ফুর্তি চাগিয়ে উঠত। কেন, তা পরে বুঝেছিলাম। জেন সেদিন আর আমার কাছে এল না। কেমন হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। এর আগেও যে দু-একবার এ রকম ঘটনা না দেখেছি তা নয়। কিন্তু এ নিয়ে মনে কোনো প্রশ্নই জাগেনি। আজ হঠাৎ মনে হল, জেন যাচ্ছে কোথায় দেখি ত। তড়াক করে উঠে রবার সোলের জুতো পরে ওর পিছু পিছু চললাম। দেখি ওয়ারলেসের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ওয়ারলেস্ অপারেটরের কাছে গিয়ে কুঁই কুঁই করতেই সে তের মিটার ব্যাণ্ডের একটা সেট খুলে দিলে। সেটা থেকে স্যুঁই স্যুঁই আওয়াজ বেরুতেই জেন কড়কড় কড়কড় করে নানান ছন্দে লিপস্টিকটা চিবোতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে সব রহস্য দিনের আলোর মতো ফুটে উঠল। ওঃ আমি কী গাড়ল! কালবিলম্ব না করে জেনারেলের ঘরে গিয়ে ওকে টেনে তুললুম। লর্ড কিচেনারকে ডাকলুম। বললুম, জেনের জন্য যে লিপস্টিক এনেছ দেখি, কুইক। জেনারেল প্রথমে অবাক হল। তারপর দুটো লিপস্টিক বের করে দিল। এক্স রের আলো ফেলে দেখলুম প্রতিটি লিপস্টিকের ভিতরের খুব সূক্ষ্ম এক ধরনের যন্ত্রপাতি রয়েছে। আর তার গায়ে লেখা মেড ইন জার্মানী। এখন সব জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সব যন্ত্র দিয়েই মাতাহারি তাহলে এতদিন বাইরে খবর পাঠিয়েছে।

আমরা তিনজন যখন সব ব্যবস্থা পাকা করে আবার ওয়ার-লেসের ঘরে গেলাম তখনও জেন পুরো লিপস্টিক চিবিয়ে শেষ করতে পারেনি। এদিকে প্রায় ভোর হয়ে আসছে।

রিভলবারটি বার করে হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললুম, গুটেনমর্গেন মাতাহারি। ওটা জার্মাণ ভাষা, বুঝলি। মানে মাতাহারি সুপ্রভাত। জেন সুট্ করে পাশের বাথরুমে ঢুকে পড়ল। জেনারেল গুলি করতে গেল। বাধা দিলুম। একটু পরে বাথরুমকে উদ্দেশ করে বললুম, ও পথে পালাবার সুবিধে নেই মাতাহারি। বাইরে পাহারা মোতায়েন আছে। ধরা এবার দিতেই হবে।

এই প্রথম বাথরুমের ভিতর থেকে অপূর্ব সুরেলা নারী-কণ্ঠ বেজে উঠল, ব্রজ, তুমি একটা আস্ত ঘুঘু। তোমার চোখে বেশিদিন ধুলো দিতে পারব না, জানতুম। বাঙ্গালীদের সঙ্গে কি এঁটে ওঠা যায়? তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এখন দয়া করে পরার কিছু দাও, নইলে বের হই কি করে?

লর্ড কিচেনার বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন।

তারপর তিনি আর্দালীকে ডাকতেই আমি হুকুম করলুম, যাও আমার ড্রেসিং-গাউনটা নিয়ে এস।

ব্রজদা চুপ করলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে এক মনে টানতে লাগলেন।

হঠাৎ সুনীল বোস বলে উঠল, ও, তাই বলুন, সেই জন্যই বুঝি জেনের সঙ্গ পেলে আপনার ফুর্তি অত—

বাধা দিয়ে ব্রজদা মুচকি হেসে বললেন, স্টুপিড্ !

পাঁচ

সুনীল বোস টাইপ-রাইটারের চাবিতে খট-খট চাপ দিতে দিতে চোখ না তুলেই বললে, ইম্‌পসিবল্‌।

সুনীত ঘোষ বললে, তার মানে বড় বড় আর্কিওলজিস্টরা যা বলছেন, আপনি বলছেন তা ভুল।

শুধু ভুল নয়, সেরেফ গুল। মাটির নিচে একটা কঙ্কাল পাওয়া গেল, আর আপনি বলে দিলেন, ওটা দশ লক্ষ বছরের পুরনো। ওটা যে আট লক্ষ বছরের নয়, বুঝলেন কি করে।

সুনীল খট-খট করে চাবিতে ঘা মারতে লাগল।

সুনীত বললে, সায়েন্সটা জানা থাকলেই বলা যায়। এই যে মৌর্য যুগের পিকদানি, কণিষ্ক-টনিষ্ক আমলের দাঁত-খড়কে, মাটিতে কোপ মারতে না মারতেই এত সব পাওয়া যাচ্ছে আজকাল, তা সেগুলো বলা যাচ্ছে কি করে। আর্কিওলজি একটা সায়েন্স ত বটে।

যত্নদা জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা মশাই, এই আর্কিওলজির জুৎসই বাংলা কথাটা কি, বলুন ত? পুরাতত্ত্ব না প্রত্নতত্ত্ব?

বললুম, দুটোই তো ব্যবহার হচ্ছে। পুরাতত্ত্ব—

ব্রজদা ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বলে উঠলেন, আরে পুরাতত্ত্বই

হল আসল তত্ত্ব। কারণ ওটার আগাপাছতলাটাই তত্ত্ব কি না। পুরাতত্ত্ব মানে পুরোটাই তত্ত্ব। কথার মধ্যেই তো মানেটা হামা-গুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে।

ব্রজদা ধপ্ করে স্থনীত ঘোষের চেয়ারটি দখল করে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তা এতক্ষণ কী বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলি তোরা?

স্থনীল বোস মেসিন থামিয়ে কপালের টাকে মোলায়েম করে হাত বুলিয়ে বললে, কেন, কালকের পেপারটা পড়েন নি। মাটি খুঁড়ে রুশ বৈজ্ঞানিকরা নিযুত-বছুরে এক হাতির কঙ্কাল পেয়েছে। তাই যদুবাবু জিজ্ঞাসা করছিলেন আর্কিওলজির ভাল বাংলা কি?

আমি বললুম, ঐ ত ব্রজদা বলে দিলেন, পুরাতত্ত্ব।

স্থনীত ঘোষ বললে, আমার ধারণা ছিল, প্রত্নতত্ত্ব। রাখাল-দাস ব্যানার্জীও বোধ হয়—

ব্রজদা মৃদু হাসিতে অবজ্ঞা ছড়িয়ে বলে উঠলেন, কে? রাখালদা। ও—

স্থনীতের চোখ কপালে উঠল। চিনতেন নাকি আপনি রাখালদাসবাবুকে?

ব্রজদা চারদিকে একবার চেয়ে জোর-গলায় বললেন, এই ব্রজরাজ কারফর্মা ভূভারতে না চেনে কাকে?

বুঝতে পারছি আপনারা অনেকেই ব্রজদার পটভূমি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। উঠবারই কথা, কারণ আমরা বাঙ্গালীরা যে আত্মবিস্মৃত জাতি। নাহলে আজ যেখানে ব্রজদাকে মাথায় নিয়ে বাঙ্গালী মাত্রেরই নাচবার কথা, সেখানে এমনই দুর্ভাগ্য আমাদের যে, ব্রজদার নামটাই আমরা ভাল করে শুনিনি।

ব্রজদাকে না জানা মানে বাংলার ইতিহাস সম্পর্কেই কানা হয়ে থাকা। কারণ ইতিহাসের বইয়ে আর কতটুকু লেখা থাকে?

ইতিহাস, ব্রজদার মতে, ঠিক যেন মহাসমুদ্রে ভাসমান বরফ-স্তূপ, যার ন ভাগের একভাগ মাত্র উপরে ভেসে থাকে আর আট ভাগই থাকে জলের তলায়। ব্রজদা বলেন, তিনি হলেন বাংলা দেশের ইতিহাসের ঐ তলানি।

ব্রজদাকে যদি আপনারা জানতেন, তাহলে বুঝতেন বাঙ্গালী কি? আপনারা আইনস্টাইনের নাম শুনেছেন, সত্যেন বোসের নামও শুনেছেন। হয়ত বোস-আইনস্টাইন থিওরীর নামও শুনে থাকবেন। কিন্তু সত্যেন বোসের সঙ্গে আইনস্টাইনের আলাপটা কে করিয়ে দিয়েছিল জানেন? আমাদের ব্রজদা। কোথায় জানেন? এই কলকাতায়, বসন্ত কেবিনে। নাইনটিন থার্টিনে। অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন বাজে কথা। তবে শুনে রাখুন। যা বলছি ঠিকই বলছি, কারণ ব্রজদা নিজমুখে এসব কথা বলেছেন।

শুধু কি এই? ব্রজদাই রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ পাইয়ে দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে কপালকুণ্ডলা লেখবার ফাক্ট যোগাড় করে দিয়েছেন, মাইকেলকে প্রাইভেট পড়িয়েছেন, বিদ্যাসাগরকে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সাহায্য করেছেন, রামমোহনকে বিলাত যাবার টিকিট কিনে দিয়েছেন, পাদ্রী কেরী সাহেবকে বাংলা টাইপের নক্সা এঁকে দিয়েছেন, জব চার্নককে—থাক্গে। জব চার্নকের কথা আজ থাক, একদিনে এত হজম করতে পারবেন কিনা, আমার সন্দেহ হচ্ছে। ক্রমশ সবই জানতে পারবেন। আমিই জানাব।

এ-হেন ব্রজদার জীবন-চরিত যে বাংলা দেশ ও দশের জন্য প্রচারের প্রয়োজন, আশা করি সে কথা আপনারা এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন। আমি তাই ব্রজদার মুখের সমগ্র বুলি সংগ্রহ করে রাখছি। কথারম্ভেই ত সে কথা জানিয়ে দিয়েছি। এবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

ব্রজদা বললেন, মাটির উপরে সত্যিকারের আছেটা কি? কচু।

সুনীত বললে, কেন, শুধু কচু কেন, লাউ কুমড়ো কফি কড়াইশুঁটি—

বিরক্ত হয়ে ব্রজদা বললেন, কেন, আর তোর মুণ্ডুটা। ক্যাচ্-ক্যাচ করিসনে, দে ত যদো একটা সিগ্রেট।

যদুদা মাথা গুঁজে কিলিম্ রিভিউ লিখছিলেন। প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে ব্রজদা সিগারেট ধরিয়ে জম্পেশ করে গোটা-কতক টান মারলেন।

তারপর বললেন, রিয়েল মাল আছে মাটির নিচে। সভ্যতা কোথায় উঠেছিল দেখতে চাস তো মাটির নিচে চলে যা। কি সব জিনিস যে আছে সেখানে দেখলে ট্যারা হয়ে যাবি! আইডিয়া করতে পারবি নে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো, ব্যাবিলন, নালন্দা যা সব বেরিয়েছে না, তার কাছে নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো, এমন কি দিল্লি বোম্বাইও কানা। হ্যাঁ, কলকাতা তবু পাদে আছে। দেখলেই মনে হয়, সদ্য মাটি খুঁড়ে বের করা টু থাউজেণ্ড বি-সি'র কোন মডার্ন সিটি। ড্রেন, পানীয় জল সরবরাহ, নাগরিক স্বাস্থ্য-রক্ষা ব্যবস্থা, কর্পোরেশন পরিচালনা করবার কায়দা, কাউন্সিলারবাবুদের আচার ব্যবহার একেবারে হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

একটু থেমে ব্রজদা বললেন, তোরা ত শুধু হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো নিয়েই লাফালাফি করিস। ঐ যে সাহেবরা বই লিখে পাবলিসিটি দিয়েছে! নামেই ত সব স্বাধীন হয়েছিস কিনা, আসলে স্লেভ মেন্টালিটি ত এখনও যায়নি। নাহলে দেখতিস, তোদের এই ব্রজদা মাটি খুঁড়ে যে সব প্রাচীন জিনিষ আবিষ্কার করেছে, হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো তার কাছে গিল্টির গহনা।



রিয়েল মাল ত আছে মাটির নিচে

জানিস তোরা যে হর্ষবর্ধনের আমলে শান্তিপুরী কাপড়ের চল ছিল? মহারাজ শশাঙ্কের আমলে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে স্যানিটারি পায়খানা ছিল? আমার মামাবাড়ির পুকুর খুঁড়তে গিয়ে আমি এসব নিদর্শন পেয়েছি। সে সব যত্ন করে আমার বাড়ির মিউজিয়ামে রেখেও দিয়েছিলাম। রয়েল সোসাইটির এক

সায়েব একদিন এসে দেখেও গেল। সায়েব ত, সহজে কি বিশ্বাস করতে চায়। প্রথমেই বললে, এখানা যে শান্তিপুরী কাপড় কি করে বুঝলে? বললুম, আমি কেমিকেল এনালিসিস করে দেখেছি। বিশ্বাস না হয় একখানা শান্তিপুরী কাপড় বাজার থেকে কিনে নিয়ে এস। আনলে একখানা, মিলিয়ে দেখে তবে সন্দেহ মিটল। স্যানিটারি পায়খানার ভাঙ্গা চিনেমাটির বেসিনটাও বেশ করে নেড়ে চেড়ে দেখলে। তারপরে জিজ্ঞেস করলে, এটা যে শশাঙ্কের আমলের সেটা নিশ্চয় করে বুঝলে কি করে? বললুম, সাহেব, পুরাতাত্ত্বিকদের যে নিশ্চয় করে কিছু বলার নিয়ম নেই। গুরুর নিষেধ আছে জান না। সাহেব নিজেও ত এই কাজে চুল পাকিয়ে ফেলেছে। ঝানু লোক। বুঝতে পারলে। থতমত খেয়ে বললে, ঠিক ঠিক, ইউ আর রাইট ব্রজদা। তখন আমি বললুম, সাহেব, পুকুর খুঁড়তে খুঁড়তে শশাঙ্কের যুগে যেই পড়েছি, অমনি এই ভাঙ্গা টুকরোটা কোদালে ঠং করে লাগল। তখনই আমি লোকজনদের সাবধান করে দিলুম। তারা অতি সাবধানে তুলে আনল। আস্ত থাকলেও না হয় সন্দেহ হত, কিন্তু ওটা যখন ভাঙ্গা তখন ওটা যে প্রাচীন সে সম্পর্কে আর সন্দেহ থাকে কি করে। তার একটু পরেই আবার খটাং, এবার একটা কলসীর কানা, তার সঙ্গে এক টুকরো জীর্ণ কাপড়। কাপড়টা পরীক্ষা করে দেখলাম, আশি নম্বর কাউন্টের সুতো, শান্তিপুরী বুনোট। আর কলসীর কানাটা মিউজিয়মে নিয়ে মিলিয়ে দেখলাম, হর্ষবর্ধনের আমলের নিদর্শনের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। এখন তুমিই বল সাহেব, তোমার কি মনে হয়। সাহেব এতক্ষণ নোট নিচ্ছিল। আমার কথা শুনে বললে, ব্রজদা আই থিংক এটা একটা গ্রেট ডিস্কভারি। বলে ত সাহেব চলে গেল। তার অনেকদিন পরে

বিলাতী কাগজের এক কাটিং দেখি বাই পোস্টে এসে হাজির। সেই সাহেবের এক বড় প্রবন্ধ।

ব্রজদার মুখের দিকে আমরা সবাই হাঁ করে চেয়ে ছিলাম। ব্রজদা আবার একটা সিগারেট ধরালেন। মৌজ করে গোটাকতক টান দিলেন। একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন।

তারপর বললেন, সে ব্যাটা এক পেল্লায় থিসিস লিখে ফেলেছে। অবিশ্যি তাই হচ্ছে দস্তুর। দুটো কথাকে দু'শ কথা করা, পাণ্ডিত্য ত তাকেই বলে কি না। যা হোক তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই ঃ বেঙ্গলের এক ভেটারান আর্কিওলজিস্ট তাঁর মামাবাড়ির গ্রামের এক পুকুর খোঁড়বার সময় মহারাজ শশাঙ্কের রেজিমে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের এক ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেছে। আমি স্বচক্ষে সেই নিদর্শন দেখেছি। পোর্সিলেনের তৈরী জিনিস, আজকাল আমরা যে-সব জিনিস ব্যবহার করি অনেকটা সেই রকম। এঁর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে বাঙ্গালীরা প্রাচীনকাল থেকেই স্যানিটেশন সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিল। এই একই লোক, একই জায়গায় আরো খানিকটা খুঁড়ে হর্ষবর্ধনের সময়কার এক কলসীর কানা এবং তার সঙ্গে জড়ানো আশি সুতোর শান্তিপুরী শাড়ির একটা টুকরোও পান। এর দ্বারা দুটো জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে, (১) হর্ষবর্ধনের সময়ে শান্তিপুরী কাপড়ের চল ছিল আর (২) শান্তিপুরী কাপড় আর কলসী (দড়ি কলসীর বদলে) গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করা তখনকার দিনের পপুলার রেওয়াজ ছিল। আর সব মিলিয়ে এই আবিষ্কার প্রমাণ করছে মহারাজ শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের রাজ্যের কিছুটা অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কারণ হর্ষবর্ধনের উপরের লেয়ারেই শশাঙ্ককে পাওয়া গেছে।

ব্রজদা বললেন, দ্যাখ, আবিষ্কারের কথা আগে থেকে বলে দিলে কি ফল হয়। তাই ত আর কোন কথা বিশ্বাস করে কাউকে বলিনে। নইলে এ শর্মার কাছে এখনও মোক্ষম মোক্ষম সব জিনিস আছে।

বলেই ব্রজদা মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে হুঙ্কার দিলেন, এই, তুই ত খুব রেডিওতে লেকচার মারিস। বল ত বেতার আবিষ্কার করেছে কে?

বললাম, মার্কনিসাহেব।

ব্রজদা বললেন, সাহেব সাহেব করেই তোরা গেলি। ভূভারতে সাহেব ছাড়া আর কিছুতে কি তোদের নজর পড়ে না।

সুনীত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আচার্য জগদীশ বোসও—

ব্রজদা খুশি হয়ে বললেন, তবু ভাল এ-দেশি একজনের নাম মনে পড়ল। কিন্তু আচার্য বোসকে পরামর্শটা দিলে কে শুনি? এই শর্মা। আসলে আমি কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে একদিন আবিষ্কার করলুম, গুপ্তযুগেও ভারতে টেলিগ্রাফ সিস্টেম ছিল, কিন্তু তারও আগে থেকে এদেশে বেতার ছিল। কথায় কথায় জগদীশদাকে একদিন ব্যাপারটা বলতেই চট করে বুঝে ফেললেন। সায়েন্টিস্ট লোক ত। তারপর লেগে পড়লেন লুপ্ত রত্নোদ্ধারে।

সুনীল বোস বললে, বলেন কি ব্রজদা!

একেবারে সেণ্টপারসেণ্ট খাঁটি কথা বলছি। ওরে এবার নিজেদের চিনতে শেখ।

ব্রজদা একটু থেমে বললেন, তবে হিস্ট্রিটা বলি, শোন। সেবার মামা বাড়িতে কুঁয়ো খোঁড়াচ্ছি। খুঁড়তে খুঁড়তে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ছাড়িয়ে গেলাম। ক্রমে ক্রমে নাইন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী, এইট্টিন্থ্ সেঞ্চুরীও পার হলাম। একটু একটু করে ছাড়িয়ে যাচ্ছি সেঞ্চুরীগুলো। ক্রমে ক্রমে 'বি-সি'তে গিয়ে পৌঁছলাম। থার্ড

সেঞ্চুরী 'বি-সি' যায়-যায়, এমন সময় ঠং। কোদালে জবর শব্দ হলো। টেনে তুললাম এক হাত পাঁচেক লম্বা তামার তার। দেখেই বুঝলাম পিওর টেলিগ্রাফের তার। রেল লাইনের ওভারহেড তার দেখেছিস ত? অবিকল যেন তাই। বুঝে দেখ কি না ছিল প্রাচীন ভারতে। প্রাচীন ভারত কি যে-সে জিনিস রে। যেন কালোয়ার পট্টি কিম্বা মল্লিক বাজারের পুরনো লোহা'র দোকান। নেই হেন জিনিস নেই।

ব্রজদা ফোঁস করে এক নিশ্বাস ছাড়লেন।

বললেন, দুঃখু এই, তোরা মাকে চিনলি নে। আমেরিকা একটা মেডিসিন আবিষ্কার করলে তোদের হৈ-হৈ-এর চোটে দেশে তিষ্ঠনো যায় না। রাশিয়া চাঁদে রকেট পাঠালে তোরা উদ্বাহু হয়ে এইসা নৃত্য করিস যে ইজের খুলে আণ্ডারওয়্যার বেরিয়ে পড়ে। কী, না পেনিসিলিন। কী, না স্পুটনিক! বলি লক্ষ্মণের বুকে যখন শক্তিশেল বিঁধল রামের পার্সোনাল সার্জেন সুষেণ যে অতবড় একটা জটিল অপারেশন করলে, তা তখন কোন কোম্পানীর পেনিসিলিন তাঁকে দিতে হয়েছিল শুনি? নাকি পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়নি বলে সেপ্টিক হয়ে লক্ষ্মণ অক্কা পেয়েছিল? বিশল্যকরণীর মত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্ষতহর ত এই ভারতেরই আবিষ্কার।

ব্রজদা বললেন, আর আমাদের বেদ-পুরাণে রকেটের যে সব বর্ণনা আছে তার কাছে তোদের স্পুটনিক লুনিক তো গোরুর গাড়ি! একবার সাঁওতাল পরগণায় টিউবওয়েল বসাতে গিয়ে আমাকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত পাইপ বসাতে হয়েছিল (রুক্ষু দেশ ত, সহজে জল ওঠে না) সেই সময় প্রাচীন-ভারতীয় রকেটের একটা পার্ট্‌স পেয়েছিলাম। মেঘুকে দেখিয়েছিলামও। খুব ইন্টারেস্ট নিয়েছিল। বলেছিল, ব্রজদা ঠিক আছে, ভাল জিনিস

এনেছ। কজন ছাত্রকে রিসার্চ করতে লাগিয়ে দেব। তা বিধি আমাদের বাম। অকালে চলে গেল। নইলে দেখতিস এযুগেও আমরা বাঙ্গালীরাই রাশিয়ানদের আগে চন্দ্র সূর্যে পৌঁছে যেতুম।

ব্রজদার স্বরে ভর করে ঘরের ভিতর শোকের ছায়া ঘনিয়ে এল। পরিবেশটা থমথম করতে লাগল।

সুনীত ঘোষ গলাটা কোনক্রমে সাফ করে নিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, মেঘু কে?

ব্রজদা বললেন, তোদের ডাঃ সাহা।

সুনীল বোস বললে, তাই বলুন। তা সে রকেটের পার্টসটা কি ছিল?

ঢেঁকির খেটে।

ঢেঁকির খেটে!!

ব্রজদা বললেন, তা এতে অবাক হবার কি আছে। বিশ্বের আদি স্পেস ট্রাভেলার মহর্ষি নারদের বাহনই ত ঢেঁকি। তোদের মডার্ন সব রকেটের মডেলগুলোর শেপও ত তাই।

একথা শুনে সুনীল বোসের টাক ফুঁড়ে ঘামের স্রোত বইতে লাগল।

তার গলা দিয়ে কোনমতে একটা আওয়াজ বেরুল, গুড গড্।

ব্রজদা ধমক দিয়ে বললেন, জয় হিন্দ বলতে বুঝি জিভটা আটকে গেল।

যতুদা সামাল দিলেন। বললেন, ব্রজদা, বেতারের কথা কি যেন বলতে শুরু করেছিলেন:

ব্রজদা বললেন, হ্যাঁ, থার্ড সেঞ্চুরী 'বি-সি'তে পৌঁছে টেলিগ্রাফের তার পেলুম, সে ত তোদের বলেছি। অতখানি খুঁড়ে পরিশ্রমও খুব হয়েছিল। সেদিনের মত তাই লোকজনদের রেষ্ট দিলাম।

পরদিন খুব ভোর থেকে আবার কুঁয়ো খোড়া শুরু হল। খুঁড়তে খুঁড়তে বি সি টি সি ছাড়িয়ে গেলাম। উপনিষদের যুগ প্রায় ছাড়াব ছাড়াব এমন সময় জোরে জোরে কোদাল চালিয়ে ঝপাঝপ গোটা দুই কোপ মারতেই—

ব্রজদা চুপ করলেন।

সুনীত সরল ভাবে বললে, রেডিওসেট পেলেন বুঝি।

ব্রজদা নিশ্চিন্তভাবে সিগারেটে দুটো সুখটান মেরে ধীরে ধীরে ধোঁয়ায় একটা ঘূর্ণি তুললেন। তারপর সহজ গলায় বললেন, না জল।

বলেই ধীরে সুস্থে উঠে পড়লেন।

সুনীল বললে, তবে যে বললেন বেতার পেয়েছিলেন।

তাচ্ছিল্যের সুরে ব্রজদা বললেন, হ্যাঁ, তা পেলাম বৈ কি।

সুনীত ঘোষ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, কি রকম হল ব্যাপারটা। সেই টেলিগ্রাফের তারের পর আর কিছুই ত পেলেন না—

ব্রজদা ততক্ষণে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তার না থাকাই ত বেতার থাকা। মুখ্যু কোথাকার।

ঢক করে দরজার পাল্লা আবার বন্ধ হয়ে গেল। ব্রজদা অদৃশ্য।

ছয়

রিপোর্টারি তোদের গে সাহিত্য করা নয়, বুঝলি। তাহলে ত রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, সেক্সপীয়র টলস্টয়, সবাই এক একজন দিগ্‌গজ রিপোর্টার হয়ে উঠতেন।

ব্রজদার এক ধমকে সুনীত ঘোষ চুবসে এতটুকু হয়ে গেল। সুনীল বোস যেন-কিছুই-হয়নি ভাব করে টাইপ রাইটারে চোখ বুঁজে আঙুল ঠুকতে লাগল।

ব্রজদা বললেন, আজকাল বুঝি বিনে কাগজেই তোরা টাইপ করিস সুনীল।

সুনীল বোস দেখল, মেসিনে কাগজ পরানোই হয় নি। অপ্রস্তুত হয়ে কাগজ পরাতে লাগল!

ব্রজদা একটু হেসে বললেন, এতেই ঘাবড়ে গেলি। অথচ আমাদের আমলে কাগজ ছাড়াই আমি টপাটপ টাইপ করে সব খবর পাঠিয়েছি! তিনটে বড় বড় স্কুপও করেছিলাম!

সুনীলের টাকে তৎক্ষণাৎ গুড়িগুড়ি ঘাম জমে গেল। এই ভরা শীতেও সে আর্তকণ্ঠে বেয়ারাকে ডাকতে লাগল।

ভানু, নরেন! কোথায় গেলি রে তোরা। ঠাণ্ডা জল আন। পাখাটা খুলে দে।

তারপর হাঁসফাঁস করতে করতে গলার টাইটা ঢিলে করে দিলে। বোতামগুলো আলগা করলে।

যত্নবাবু মঞ্জু দের ছবিটা ক'কলম ব্লক করতে দিলে ভাল হয়, ধ্যানস্থ হয়ে তাই ভাবছিলেন। ব্রজদার কথায় চমকে উঠলেন।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে উঠলেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

ব্রজদা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েছেন মনে হল। বললেন, "করিস ত সিনেমা এডিটারি, রিপোর্টারির মর্ম বোঝা কি অতই সোজা। দে, একটা সিগ্রেট দে।

জম্পেশ করে এক সুখটান মেরে ব্রজদা বললেন, ঐ যে একটু আগে সুনীল যা করছিল, মেসিনে কাগজ না পরিয়ে খটখটাস, ঠিক অমনি করে করেই আমি এককালে ওয়ার্লড্‌স্‌ বেস্ট স্কুপ করেছি।

সুনীত ঘোষ বলল,যাব্‌ বাবা, তা আবার কেউ পারে নাকি?

ব্রজদা গুম্‌ মেরে যেতেই আমরা সর্বনাশের আভাস পেলাম। বে-অব-বেঙ্গলে ডিপ্রেশনের আভাস পেলে আলিপুর হাওয়া-আফিসের বড় সাহেবের মনের ভাবখানা যেমন হয়ে ওঠে, আমার অবস্থাও তাই হয়ে উঠল। একটা সাইক্লোন, ১০০ মাইল গতি-বেগের ঝড়-ঝঞ্ঝা, কি যে উঠবে কে জানে?

নাঃ, মেঘ কেটে গেল।

ব্রজদা বললেন, স্পেশাল করেসপণ্ডেন্টরা সব পারে।

বললাম, স্পেশাল করেসপণ্ডেন্ট—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব্রজদা বললেন, রিপোর্টারেরই পরিবর্ধিত সংস্করণ আর কি। রাজ সংস্করণও বলতে পারিস। ছাপা বাঁধাই বেশ ভাল। যেমন রিপোর্টার যদি আমড়া ত স্পেশাল করেসপণ্ডেন্ট হল গে ফজলি আম। রিপোর্টার যদি পাবদা মাছ, তো স্পেশাল করেসপণ্ডেন্ট হল গে রাঘব বোয়াল। এই যে আমি, ব্রজরাজ কারফর্মা, এই আমার কথাই ধর, আমি

যখন কলকাতার কংগ্রেস কভার করব, তখন আমি স্টাফ রিপোর্টার, কিন্তু ঐ কাজে মালদয় গেলে সেই আমিই আবার স্পেশাল করেসপণ্ডেণ্ট। তোরা এখনও নতুন ত, এসব এডিটোরিয়াল সিক্রেট বুঝতে সময় নেবে।

যাক গে, যা বলছিলাম। ন্যাশন্যাল নিউজ প্রেসের ওয়ার করেসপণ্ডেণ্ট হয়ে ত মেসোপটোমিয়ায় গেলাম। নাইনটিন ফিফটিনে। কলকাতা থেকে আমি আর বোম্বাই থেকে এক পার্শী ছোকরা। নাম গুল মার্চেণ্ট। ছোকরা একেবারে আনকোরা নতুন। তাকে তালিম দিতে দিতেই আমার ত্রি-ফোর্থ এনার্জি খরচা হয়ে গেল। আমি তো এডভান্স পার্টির সঙ্গে ফ্রণ্টে আছি। গুল মার্চেণ্ট আছে প্রেস হেড কোয়ার্টারে। যা পাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ড টেলিফোনে গুলকে জানিয়ে দিচ্ছি! গুল টেলিগ্রাম ঝাড়ছে। সব কিন্তু কোডে। রয়টার ফয়টারকে আমরা সেবার কানা করে দিয়েছিলাম। দনাদ্দন গুলি চলছে, বেয়নেট চার্জ হচ্ছে, তুরুকরা পিছু হঠছে। হাজারে হাজারে মরছে। প্রথম ট্রেঞ্চে বসে বসে ফিল্ড গ্লাস চোখে এঁটে দেখছি। আর আই-উইট্‌নেস বিবরণ পাঠাচ্ছি। আমার মাথার সঙ্গে হেডফোন আর মাউথ-পিস্ বাঁধা। কোলের উপর টাইপ রাইটার। মুখে মুখে টেলিফোনে বলছি আর এক হাতের পাঁচ আঙ্গুলে ঝড়ের মত টাইপ করেছি। আমার স্পীড্ ছিল পার মিনিটে দেড় শ ওয়ার্ড। তোদের মত টুকুস টুকুস এমন বেতো টাইপ করলে আমাদের আমলে তৎক্ষণাৎ চাকরি যেত। নিউজ এডিটার সঙ্গে সঙ্গে মাইনে চুকিয়ে দিয়ে বলতেন, যাও বাবা মার্চেণ্ট অফিসে যাও। তখন, বুঝলি নে, সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হত। যা হোক, সেদিন তন্ময় হয়ে ভিভিড ডেসক্রিপসন দিচ্ছি। হঠাৎ দেখি আশপাশ থেকে গুর্খারা বাঘের মত তুর্কিদের উপর লাফিয়ে পড়ল। বেয়োনেটের



এডভান্স পার্টির সঙ্গে ফ্রণ্টে আছি।

খোঁচা দিতে দিতে তুর্কিদের পিছু পিছু তাড়া করে চলল। মুহূর্তে ট্রেঞ্চ খালি। একা আমি শুধু বসে আছি। কি করব ভাবছি, এমন সময়, 'হ্যালো ব্রজ, রেস্ট নিচ্ছ বুঝি, তা নাও, আমি একটু ঘুরে আসি' বলে রয়টারের বাঘা করেসপণ্ডেণ্ট মিঃ রিউমার মঙ্গার আমাকে ঠাট্টা করে সামনের দিকে দৌড় দিলে। এই ব্যাটাই ছিল আমার এক নম্বর রাইভাল। ও যে কখন এসেছে আমি

দেখিনি। জানিস ত, কেউ মেরে বেরিয়ে যাবে তোদের ব্রজদা প্রাণ থাকতে তা হতে দেবে না! উইদিন এ সেকেণ্ড টাইপ রাইটারটা গলায় বেঁধে নিলাম। ঐ যে বন্যার সময় চাঁদাওয়ালারা কেমন করে সিঙ্গিল রীড হারমোনিয়াম গলায় ঝোলায় অবিকল তেমনি করে। তারপর যে স্পীডে এইট হাণ্ড্রেড ইয়ার্ড রেসে ওয়ার্লড রেকর্ড ব্রেক করেছিলুম নন্‌-অফিসিয়াল অলিম্পিকে, সেই স্পীডে দিলুম এক দৌড়। তখনও কিন্তু ফোনে আমার মুখ আর টাইপ রাইটারে আমার হাত সমানে কাজ করে চলেছে। তিন চার মিনিটের মধ্যেই মিঃ রিউনার মঙ্গার এক ফার্লং পিছিয়ে পড়ল। ওর মধ্যেই আমার ফার্স্ট মেসেজ গুল মার্চেন্টের কাছে পৌঁছে গেছে। নিউজ সবার আগে পাঠাতে যে না পারে সে আবার রিপোর্টার কি? ঘাঘু রিপোর্টাররা অনেক সময় ঘটনা ঘটবার আগেভাগেই তাই মেসেজ পাঠিয়ে বসে থাকে।

স্নীত ঘোষ ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠল, সে আবার কি কথা? ঘটনা না ঘটলে আবার রিপোর্ট লেখা যায় না কি?

তোমার মত পুঁচকে পেতি রিপোর্টার হলে লেখা যায় না, আমার মত পোড় খাওয়া স্পেশাল করেসপণ্ডেন্ট হলে যায় বৈকি! জগতের বড় বড় কাগজের দিগ্‌গজ স্পেশাল করেসপণ্ডেন্টরা ক'টা রিপোর্ট আর দেখে লেখেন। বেশির ভাগ ডেসপ্যাচ্‌ই তাঁরা আগে তারবাবুর হাতে গস্ত করে দিয়ে তারপরে ধীরেসুস্থে নিশ্চিন্ত মনে ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করে থাকেন।

ব্রজদার মুখের দিকে স্নীত ঘোষ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখে ব্রজদা স্মিতহাস্যে বললেন, রিপোর্টারের কাছে সব থেকে জরুরী কি বল দেখি?

স্নীত বীরের মত বললো, খবরের সত্যতা যাচাই।

ব্রজদা বললেন, তোমার মাথা! তুমি কচু বুঝেছ। টেলিগ্রাফ আফিস। টেলিগ্রাফ আফিসটি আগেভাগে ক্যাপচার করতে পারলেই তোমার বার আনা কাজ হাসিল হয়ে গেল। আর যে চার আনা বাকি রইল তা দিয়ে তুমি খবরই পাঠাও, আর আপিসকে টাকা পাঠাবার তাগাদাই দাও, যা তোমার খুশি। খবর কি আদালতের জবানবন্দী, যে তার সত্য মিথ্যা যাচাই করতে হবে। হিজরের যেমন স্ত্রী-পুরুষ হয় না, খবরেরও তেমনি সত্য-মিথ্যা হয় না। তাই রিপোর্টার যা পাঠায় তাই খবর।

ব্রজদা বললেন, এই দালাই লামা যখন পালাই লামা হয়ে এবার ভারতে আশ্রয় নিতে এলেন, তখনকার কথাই ধর। দালাই লামা সবে তাওয়াং মঠে এসে পৌঁচেছেন, বিলাতি কাগজের বড় বড় করেসপণ্ডেণ্টরা কলকাতায় বসেই কেমন সুন্দর করে দালাই লামার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ নিজের নিজের কাগজে কত আগে পাঠিয়ে দিলে। আর তোরা এই দেশের লোক হয়ে কি করলি, দালাই লামার সঙ্গে দেখা করার জন্য হাত গুটিয়ে বসে রইলি। দালাই লামা আসতে আসতে ততদিনে তার খবর বাসি হয়ে গেল। কি করব, নিতান্ত রিটায়ার করেছি তাই, নইলে দালাই লামা লাসা ছাড়বার আগেই তাঁর সঙ্গে এক্সক্লুসিভ্ ইণ্টারভিউ-এর বিবরণ লিখে দিতুম। তোরা কি রিপোর্টার? কলকাতায় ত রিপোর্টার আছে দু তিন জন, আর ত সবই মুহুরি। যা দেখে তা ছাড়া কিছু লিখতে পারে না।

ব্রজদা রাগে গরগর করতে লাগলেন।

বিনীতভাবে বললাম, কিন্তু নাইনটিন ফোর্টিন ত এখনও শেষ হল না।

ব্রজদা তৎক্ষণাৎ শুধরে দিলেন, নাইনটিন ফিফ্‌টিন।

তারপর বললেন, হ্যাঁ, মেসেজ পাঠাতে পাঠাতে ছুটতে লাগলুম। সেদিন যা ঘটেছে তা ত দিলামই, পরেও যা ঘটবে তারও ছু তিন দিনের রিপোর্ট আগাম দিলাম পাঠিয়ে। অবশ্য এসব, এই এ্যাডভান্স মেসেজ লেখবার কায়দা আছে। লিখলেই ত হল না। রিপোর্টারকে সেফ্‌ সাইডেও থাকতে হবে। ধর, আজ আমি রিপোর্টটা লিখছি। কিন্তু ঘটনাটা ঘটবে ছুদিন পরে। খবরটা আফিস পৌঁছুতেই ছুদিন লাগবে। কাজেই আপ টু ডেট করার জন্য আমি ছুদিন পরের ডেট লাইনই দেব। এখন ধর, আমি আজ লিখে বসলাম ঃ অদ্য মিত্র সৈন্য মেসোপটেমিয়ায় শত্রু শিবির দখল করিয়া ফেলিয়াছে। তারপর যদি সত্যি সত্যিই দখল করতে না পারে ত আমার বেইজ্জতির আর বাকী থাকবে না। তাই গাড়লের মত ডিরেকটলি না লিখে রিপোর্টটা আরম্ভ করতে হবে এইভাবে ঃ বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত একটি নির্ভরযোগ্য গুজবে প্রকাশ,—

সুনীল বোস মুখ ফসকে বলে ফেললে, গুজব আবার নির্ভরযোগ্য হয় কি করে ?

ব্রজদা বললেন, তোদের হাতে হয় না বলেই আজ তোদের এই অবস্থা। আমার চিফ রিপোর্টার আমাকে নিজে হাতে তালিম দিয়েছেন, তা জানিস। আমাকে প্রায়ই বলতেন, ব্রজ সাদা কথায় সিধে ভাবে কখনও কিছু লিখ না। কখনও কোন জিনিস কমিট্‌ কর না। রিপোর্টের মধ্যে সব সময় "প্রকাশ", "আরও প্রকাশ", "নাকি", এসব যত পার ঢুকিয়ে দেবে, বাস্‌ তাহলেই সেফ্‌ সাইডে থাকবে। ভাল ভাল রিপোর্টাররা এখনও দেখিস 'প্রকাশ' না লিখে কিছু প্রকাশই করতে পারে না।

সুনীল বোস বললে, কিন্তু ভাষার একটা অর্থ থাকবে তো।

ব্রজদা বললেন, এঃ, কী আমার সুনীতি চাটুজ্জে এলেন রে। ভাষা নিয়ে রিপোর্টার কি ধুয়ে খাবে? ভাসা ভাসা থাকাই ত তার পক্ষে ভাল। তাতেই সেফ্ সাইড্। আমার চিফের মত সদগুরু সঙ্গ তোর যে হয় নি তা বুঝতে পারছি। রিপোর্টারির রি-ও শিখিস নি। আমার চিফ্ রিপোর্টার আরও বলেছিলেন, খবরদার নিজের কথা রিপোর্টে লিখো না, যদি নিতান্তই নিজের কথা বলতে হয়, তবে পরের জবানিতে বল। তেমন কাউকে যদি 'কোট' করার না পাও তবে আমরা যার জবানিতে বলি, সেই লবি মহল আর ওয়াকিবহালের মারফতে বল। সে নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আর তা করেছি বলেই তোদের ব্রজদা আজ এত বড় রিপোর্টার হতে পেরেছে। লর্ড কার্জন থেকে লিনলিথগো অব্দি সবাই এই ব্রেজো রিপোর্টারের নামে থরথর করে কাঁপত। বুঝলি না, ওদের হাঁচি কাশি অব্দি কাগজে স্কুপ করে দিতাম কিনা। আমাকে না পেলে গান্ধীজী কোন ঘোষণাই প্রেসে দিতেন না। সেটা জানিসনে বোধ হয়। যা কিছু সব আমার এই হাত দিয়ে হয়েছে। একবার সবরমতিতে গেছি, দেখি বাপু খুবই ভাবিত। কি ব্যাপার? না কাকে ওর সাক্সেসার করবেন, এই খালি ভাবছেন। বললাম, বাপু, এত ভাবছ, কেন, তোমার মন যাকে চাইছে তাকেই কর। জবাহরই উপযুক্ত লোক। বাপু খর দৃস্টিতে খানিকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়ে বললেন, ব্রজ, আমার মনের কথা তুমি টের পেলে কি করে? হাসতে হাসতে বললাম, বাপু ভুলে যাচ্ছ কেন আমি রিপোর্টার। স্কুপ করাই আমার পেশা। বুঝলি রে, তোদের ব্রজদা এমনি এমনিই এত বড় রিপোর্টার হয় নি।

সুনীল বলল, তারপর সেই টাইপ রাইটারের গল্পটার কি হল।

ব্রজদা গম্ভীরভাবে বললেন, তোদের ব্রজদা কখনও গালগল্প করে না। যা বলে, ট্রু, ফ্যাক্ট।

কিছুক্ষণ পরে ব্রজদা বললেন, দনাদ্দন দনাদ্দন তখন শেল ফাটছে, ফট ফট গুলি ছুটছে। বোমা ফেটে মুহুর্মুহু ভূমিকম্প হচ্ছে। আর আমি ডাইনে বাঁয়ে বাঁচিয়ে ওর মধ্যে দিয়েই পথ করে বুলেট বেগে ছুটে চলেছি। আরও কিছুটা এগিয়েছি, দেখি তুরুক বাহিনীর এক হাই অফিসার মরে পড়ে আছে। জর্নেল কর্নেল হবে বোধ হয়। জ্যান্ত লোক আর পাব কোথায় সেখানে, তাই ওর সঙ্গেই একটা এক্সক্লুসিভ ইণ্টারভিউ ঝেড়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে নিউজটা বলে যাচ্ছি ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত মৃত সৈনিকের দেহ পড়িয়া আছে। মৃত সৈনিকদের জনৈক মুখপাত্রের সহিত আমার এক বিশেষ সাক্ষাৎকার ঘটে। উক্ত মুখপাত্র জানান আট ঘণ্টা পূর্বে মিত্রপক্ষের গোলন্দাজবাহিনী নাকি প্রবল গোলা বর্ষণ করে। প্রকাশ, তাহাতেই নাকি তুর্কী বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় এবং অনুমান প্রায় বহু সৈন্যের মৃত্যু ঘটে। আরও প্রকাশ, উক্ত মুখপাত্রও আমাদের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারের আধ ঘণ্টা পূর্বে মারা যান। এই খবরটুকু বলেছি এমন সময় পিঠে সঙ্গীনের খোঁচা! তুর্কীদের হাতে বন্দী হলাম। ছোট্ট একটা গ্রামের বুরুজের উপর আমাকে দিনরাত নজরবন্দী করে রেখেছিল। তবে রিপোর্টার বলে টাইপ রাইটারটা কেড়ে নেয়নি। আমি করলাম কি, টাইপ রাইটারের বারের উপর ছোট্ট এক দাড়ি কামানো আয়না এমনভাবে ফিট্ করে দিলাম যেন তার উপর রোদ পড়ে চিকচিক করতে থাকে। তারপর আয়নার

মুখটা বেস্-হেড-কোয়ার্টারের দিকে ফিরিয়ে টাইপ রাইটারের চাবি টিপে টিপে খবর পাঠিয়ে যেতুম আর গুল মার্চেন্ট ষোল মাইল দূরে বসে সেই আয়নার উপরে এসে পড়া মধ্য প্রাচ্যের সেই তেজি রোদের রিফ্লেক্সান দেখে দেখে সেগুলো টুকে নিত। এইভাবে আমি একটার পর একটা স্কুপ করেছি। এর নাম রিপোর্টিং! তোরা ওয়েজবোর্ডের বরপুত্তুররা সে সব জিনিস কল্পনাও করতে পারবি নে।

সাত

সুনীত ঘোষ মরীয়া হয়ে বললে, তা হলে কি কোন উপায়ই নেই বলতে চান?

সুনীল বোস বললে, উপায় থাকবে না কেন। পাড়ার মস্তানদের দলে ভিড়ে হয় গেট ভেঙ্গে স্টেডিয়ামে ঢুকুন, আর নয় সুবোধ বালকটি হয়ে বিড়ির দোকানে রেডিওর কমেন্টারি শুনুন। টিকিট কেনবার বাসনা যদি মনের কোনে পুষে রেখে থাকেন ত সেটাকে গঙ্গাসাগরে ভাসিয়ে দিন। আরজন্মে যদি ক্রিকেট কর্ত্তাদের রিলেটিভ্ রূপে কলকাতায় জন্মাতে পারেন, তাহলে হয়ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

সুনীত ঘোষ ব্যাজার হয়ে বললে, খেলা দেখার মনোবাঞ্ছাটা যদি আমার হত, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? কান দিয়েই খেলা দেখার সুখ মেটাতাম। ইচ্ছেটা জজ সাহেবের কিনা।

সুনীল বললে, জজ সাহেবের! জজের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক।

সুনীত থতমত খেয়ে বললে, আমার সঙ্গে তাঁর ডিরেক্ট সম্পর্ক কিছু নেই। তবে উকিলদের সঙ্গে ত সম্পর্ক আছে। তাই আমার উকীলবাবু বললে—

যদুদা টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন আর কান পেতে সুনীতের কথা শুনছিলেন।

ফস্ করে বলে বসলেন, সে কি মশাই সে মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

বলেই জিভ কেটে টেলিফোনে বললেন, ওঃ ভেরি সরি, না আপনাকে নয়, কথাটা বললাম আমার এক ফ্রেণ্ডকে। সামনেই বসে আছেন। হ্যাঁ মেয়াদী মামলা। আবার কি, সেই বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়ার চিরকেলে ডোমেস্টিক ঝগড়া। কি বললেন, কদিনের মামলা? এক্ট মশাই····

যদুদা সুনীত ঘোষকে জিজ্ঞেস করলেন, কদিনের মামলা?

সুনীত বললে, এই তিন বছরে পড়ল।

যদুদা টেলিফোনধারীকে বললেন, এই থার্ড ইয়ারে পড়ল। হাঃ হাঃ হাঃ। যা বলেছেন। আচ্ছা, ঐ কথাই রইল।

রিসিভারটি ঠিক করে রেখে যদুদা মন্তব্য করলেন, বাড়ি ভাড়ার বখেড়া মেটাতে আদালতের তিন বছর পার হয়ে যায়! যা হচ্ছে না আজকাল! কি আর বলব।

সুনীত ঘোষ বললে, সেই জন্যই ত আমার উকীল টেস্ট খেলার একখানা টিকিট জোগাড় করতে বললে।

সুনীল বোসের মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল।

যাব্ ব্বাবা, তা আপনার মামলার সঙ্গে টেস্ট খেলার রিলেসান কি?

সুনীত ঘোষ এবার চটে গেল।

একখানা টিকিট দেবার মুরোদ নেই। তখন থেকে খালি টিক টিক করছেন। রিলেসান কি, সম্পর্ক কি? যত সব ফালতু কোশ্চেন। রিলেসান কি একটা, যে এক কথায় বলব।

সুনীত ঘোষ মাটির মানুষ। সাত চড়ে রা কাড়ে না। তাকে

হুম করে খেপে উঠতে দেখে সুনীল বোস ঘাবড়ে গেল। টাকে বার ছুয়েক হাত ঘষে নিল।

তারপর আমতা আমতা করে বললে, তা চটছেন কেন?

সুনীত ঘোষ লজ্জায় স্বর খাদে নামিয়ে ফেলল।

বললে, মাথার ঠিক নেই মশাই, মাপ করবেন। শিরে সংক্রান্তি কিনা। মামলায় হেরে গেলে যে কেয়ার অফ্ ফুটপাত হয়ে যাব। টেস্টের টিকিট ছিল লাস্ট চান্স্। কিন্তু সে চান্স্ও ত দেখছি পাংকচারড্ হয় হয়।

ব্যাপারটা তাহলে বলি। যে জজের এজলাসে আমার মামলা, তার একটিই মাত্র মেয়ে। আর সে মেয়ে আবার ক্রিকেট ফ্যান। আব্বাস আলি বেগের গলায় মালা দেবার চান্স্ পেল না বলে অন্নজল ত্যাগ করেছিল। মাদ্রাজে কুন্দরামের খেলার রেজাল্ট দেখে আশায় বুক বেঁধে বসে আছে। নিজে হাতে রেশমের মালা গেঁথে রেখেছে মশাই। যদি কুন্দরাম কলকাতার টেস্টে কোয়ার্টার সেঞ্চুরীও করতে পারে তাহলে আর কথা নেই। আনন্দ-থ্রিল্ড হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে যাবে, কুন্দরামের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়েই তার গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দে মূর্চ্ছা যাবে। প্ল্যান সব ঠিক করে রেখেছে। এমন সময় বিসমিল্লায় গলদ, সিজিন টিকিট গায়েব হয়ে গেল। বাপকে বললে, টিকিট একটা জোগাড় করে দেবে ত দাও, নইলে এই হাঙ্গার-স্ট্রাইক করলুম। আদুরে মেয়ে ত। যে কথা সেই কাজ। আজ সাতদিন ধরে সেরেফ অনশন। শুধু সেদ্ধ ডিম আর র কফি খাচ্ছে। জজ গিন্নী ছুবেলা কপাল চাপড়াচ্ছেন আর 'কি লোকের হাতে বাপ আমাকে তুলে দিয়েছেন গো' বলে নন্ স্টপ্ বিলাপ সুরু করেছেন। এ অবস্থায় কেউ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারে, বলুন।

রোজ জজ সাহেব যে মেজাজ নিয়ে এজলাসে আসছেন, তাতে কি করতে যে তিনি কী করে বসবেন, সেই ভাবনায় আমার উকীল অস্থির। না হলে যে উকীল তিন বছর ধরে আমাকে 'নির্ঘাৎ জিতে যাবেন' বলে ভরসা দিয়ে এসেছেন, তিনি এখন বললেন কিনা, 'কিচ্ছু বলা যায় না মশাই, হাওয়া বড় খারাপ। বাঁচতে চান ত শিগ্‌গির একখানা টিকিট জোগাড় করুন।'

একটু থেমে স্থনীত বললে, এখন বুঝলেন রিলেসানটা। কি করি বলুন ত।

বললুম, এতই যখন দরকার তখন ব্ল্যাক মার্কেটের দ্বারস্থ হন।

স্থনীত বললে, সে চেষ্টাও করেছি মশাই। দুদিন আগে আমাদের পাড়ার হেবোদার হাতে উনিশখানা পঁচিশ টাকার টিকিট দেখলাম। আমায় বললে, নিবি। আমার কস্ট প্রাইস্ পড়েছে চাল্লিশ। কাল পর্যন্ত ষাট টাকায় ঝেড়েছি। আজ সেভেন্‌টি ফাইভে তোকে একখানা দিতে পারি। আসছে কাল সেঞ্চুরি করব মাইরি। নিবি ত এই বেলা নিয়ে নে, ক্যাশ ডাউন, নো চেক বিজনেস বাওয়া। একটু হেজিটেট্ করলাম। পঁচিশ টাকার টিকিট পঁচাত্তরে নেব—

পঁচিশ টাকার টিকিট পঁচাত্তর, এত খুব' সস্তারে গাড়োল। খেলার মত খেলা হলে দুটাকার টিকিটও একশ টাকায় বিক্রি হয়, তা জানিস্। হয়েও ছিল।

ব্রজদার আওয়াজ পেতেই চার জোড়া চোখ পিছনে চাইলে। ব্রজদা ততক্ষণে যদুবাবুর টেবিলের কাছে পৌঁছে গেছেন। আমি সসম্মানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ব্রজদা ধপাস করে বসে পড়লেন। স্থনীল বোস বারবার মুখ মুছতে লাগল।

একবার বললে, এইবার তাহলে পাখাটা খুলে দেওয়া যাক, নইলে গরমে বসা যাবে না।

ব্রজদা বললেন, তোমার গরমটা একটু বেশি হয়েছে দেখছি। জানুয়ারি মাসে পাখা খুলে বন্ধুবান্ধবের বিপদ ঘটানোর চাইতে এই বেলা একটা বিয়ে থা করে ফেল।

ব্রজদার কথায় বাঁকা বাঁকা ভাব দেখে আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, দু টাকার টিকিট একশ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। সে কি খেলায়?

ব্রজদা সহজ হলেন।

বললেন, যে খেলায় কলকাতায় টিকিট নিয়ে সব থেকে বেশি কাড়াকাড়ি হচ্ছে, সেই ক্রিকেট খেলায়। সাহেবরা সেবার বড় মুখ করে বিলেত থেকে খেলতে এসেছিল ত, তা টীমটাও বড় সরেস এনেছিল জার্ডিন। ভারতে নেমে একটার পর একটা খেলায় জিতে ব্যাটার সাহস বড় বেড়ে উঠেছিল, সেই জার্ডিন সাহেব কলকাতার মাঠে এক বাঙ্গালীর কাছে রাম প্যাঁদান খাচ্ছে, কথাটা লাঞ্চের আগে মুখে মুখে ছড়িয়ে যেতেই ডালহৌসী স্কোয়ার খালি করে সাহেব মেমেরা এসে ভিড় করল মাঠে। টিকিটের দাম না বেড়ে আর যায় কোথায়? সাহেবদের ঐ একটা অসাধারণ গুণ। খেলাধূলার ব্যাপারে নিতেটার মত অত পুতু পুতু করে না। টিকিট একটা পেলেই হল, অ্যাট এনি দাম। কিনলেও তাই! লাঞ্চের আগে যারা দু টাকার টিকিটে ঢুকেছিল, একশ টাকার নোট পেয়ে গেট পাস ঝেড়ে দিয়ে তারা গাছের ডালে উঠে বসলে।

সুনীত ঘোষ ততক্ষণে নিজের কথা ভুলে গেছে।

উত্তেজনা চেপে জিজ্ঞেস করলে, কার খেলা দেখতে এত ভিড় হয়েছিল ব্রজদা?

ব্রজদা একগাল হেসে স্নেহ ঝরিয়ে বললেন, সত্যিই তুই বড় বোকা নিতে। তোদের ব্রজদা ছাড়া একাজ আর কে করতে পারে? এই সাদা কথাটা ধরতে পারলি নে।

সুনীল বোস বলে উঠল, আপনি আবার ক্রিকেটও খেলেছেন নাকি। কই জানতাম না ত।

ব্রজদা খপ্ করে প্রশ্ন করলেন, তোর ঠাকুর্দার বাপের নাম কি বল ত।

সুনীল বিষম খেল। কিছুক্ষণ মাথা চুলকাল।

তারপর বোকার মত বললে, জানি নে।

অথচ ঔরঙ্গজেবের ঠাকুর্দার বাপের নামটি মুখস্থ করে রেখেছ। তোমার আর দোষ দেব কি, দোষ আমাদের জাতীয় শিক্ষার।

ব্রজদা একটু থেমে বললেন, আমাদের শিক্ষা ত নিজের লোককে চিনতে শেখায় না। তাই ত ব্র্যাডম্যানের নাড়ি নক্ষত্রও জান অথচ তোমাদের ব্রজদা যে ক্রিকেটে ওয়ার্লড রেকর্ড করেছে, পৃথিবীর কোন ক্রিকেটারই যার ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি, সে খবর তুমি, তুমি কেন, কোন বাঙ্গালীই জানে না। বাঙ্গালীর অধঃপতন কি সাধে হয়েছে!

বিরক্তি ছড়িয়ে ব্রজদা বললেন, দে যদু, একটা সিগারেট।

হুস্ করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ব্রজদা বোধ করি মেজাজটাই সাফ করে নিলেন।

বললেন, তবে শুনে রাখ, মাত্র তিন ওভারে সেঞ্চুরি করে শুধু ওয়ার্লড রেকর্ডই করিনি, ক্রিকেট খেলার আইনকানুনে নতুন একটা প্রবলেমও সৃষ্টি করেছি। আজ পর্যন্ত তার সমাধান হয়নি। যদি কখনও চান্স পাস অরিজিন্যাল বৃটিশ ক্রিকেট ম্যানুয়ালখানা খুলে দেখিস। দেখবি "ব্রজদাস্ পাজল্" বলে একটা কথা তাতে আছে।

আমরা চারজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম, ব্রজদাস্ পাজল্! সে বস্তুটা কি?

ব্রজদা একটু নড়েচড়ে তারপর আবার স্থির হয়ে বসলেন। একেবারে যেন কাম্বোডিয়ার ধ্যানী বুদ্ধটি।

ধীর গম্ভীর গলায় আওয়াজ বেরতে লাগল, যে বল ব্যাটের ঠুকুস ঘা খেয়ে মাঠের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে বাউণ্ডারি লাইন পার হয়, ক্রিকেট রুলে তাকে বলে বাউণ্ডারি, তার রান চার। আর যে বল ঠকাস ঘা খেয়ে বাপ বাপ ডেকে তোল্লা হয়ে বাউণ্ডারি পেরোয়, তার নাম ওভার বাউণ্ডারি, তার রান ছয়। এসব নিয়ম ত দুধের ছেলেরাও জানে। কিন্তু ব্যাটসম্যানের হাঁকড়ানির চোটে যে বল বিপ বিপ করতে করতে স্পুটনিক হয়ে আকাশের বাউণ্ডারি পার হয়, তার রান কত? আর সে বাউণ্ডারির নামই বা কি? আজ পর্যন্ত তা ঠিক হয়নি। কারণ ক্রিকেটের জন্ম ইস্তক আকাশের বাউণ্ডারি বল পার করতে পারে এমন ব্যাটসম্যান একটাই জন্মেছে—

সুনীল বোস মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ফেললে, তিনি আমাদের ব্রজদা।

ব্রজদা কোন কথা না বলে নাকমুখ দিয়ে সেরেফ ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

একটু পরে বললেন, কিন্তু একজনের জন্য ত আর রুল হয় না। তাই জার্ডিন সাহেব বলেছিল, ব্রজদা তোমাকে গ্রেট বললে ছোট করা হয়, ইউ আর ডাবল গ্রেট। দুঃখ এই তোমার আর জুড়ি জন্মাবে না, তাই ক্রিকেটে তোমার এই থার্ড ডাইমেনশন আর আনাও যাবে না, আমাদের চিরকাল বাউণ্ডারি আর ওভার বাউণ্ডারি নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে। তবে তোমার যে মারে বল

আকাশে মিলিয়ে যায়, সেটা হিস্ট্রিতে ব্রজদাস্ পাজল্ বলে আবহমান কাল ধরে লেখা থাকবে।

আগুনটা সিগারেটের একেবারে লেজে এসে ঠেকেছিল। তাই ব্রজদা তাড়াতাড়ি সুখটান মেরেই সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিলেন।

শুধু ঐ একটাই নয়, আরও আছে।

সুনীতের ডিউটি ছিল, উঠতে যাচ্ছিল। ও কথা শুনে ধপাস করে বসে পড়ল।

ব্রজদা বলে চললেন, কথাটা যখন উঠলই, তাহলে সব খুলেই বলি। জার্ডিনের দল যখন এল, ভারতের ক্রিকেট গগনে তখন সব চন্দ্র সূর্যই বিরাজ করছেন। নাম আর কারও করব না, তোরা কাগজের পুরনো ফাইল দেখে নিস। তবে এটাও সত্যি, ছোকরারা ফাইট দিয়েছিল ভাল। ইণ্ডিয়া হারছিল তবে রিয়েল স্পোর্টসম্যানের মত হারছিল। আসলে যারা হারে, স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটা দেখাবার চান্স তারাই কিন্তু পায়। এটা আমি বরাবর দেখেছি। জার্ডিনের দল কলকাতায় এলে লাটসাহেব তাঁদের অনারে একটা পার্টি দিলেন। সেই পার্টিতে লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী কথায় কথায় আমাকে জাত তুলে একটু খোঁচা দিলে। বললে, ক্রিকেট ত সিভিলাইজ্‌ড্ খেলা, রপ্ত করতে ইণ্ডিয়ার সময় নেবে। কি বল ব্রজদা? ন্যাশনাল স্পিরিটে ঘা লাগলে তোদের ব্রজদা ছেড়ে কথা কয় না, জানিস ত। বললাম, সাহেব যা বললে, আমাকে বললে। খবরদার একথা আর কাউকে বল না। একে সাহেব তায় লাটের খাস মুন্সি। তেরিয়া হয়ে বললে, কি বলতে চাইছ। বললাম, তোমার জার্ডিনের ভাগ্য ভাল বাঙ্গালীদের পাল্লায় পড়েনি। তাই মান

সম্মান বজায় রেখে দেশে ফিরতে পারছে। সাহেব বললে, তার মানে! বললাম, ঐ যা বললাম তার থেকেই বুঝে নাও। বাঙ্গালীদের খপ্পরে পড়লে তোমার ঐ জার্ডিনের এম সি সি একেবারে টেম সি সি হয়ে যেত। যদি সাহস থাকে, তোমার জার্ডিনকে বল না নেট প্র্যাকটিসের দিন আমাদের সঙ্গে এক হাত খেলে যাক। এমন সময় লাট গিন্নী সেখানে এসে হাজির হলেন।

হ্যাল্লো ব্রজদা, বলে লাটগিন্নী আমার সঙ্গে হ্যাণ্ড সেক করলেন। তারপর একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? মাথায় যেন কোন মতলব ঘুরছে। বললাম, ম্যাডাম, তুমি চ্যারিটি করে রেডক্রসের জন্য টাকা তুলবে বলেছিলে, তা সেই ব্যাপারে আমার মাথায় এক আইডিয়া এসেছে। জার্ডিন সাহেবকে বল না, আমাদের সঙ্গে এক ইনিংস চ্যারিটি ম্যাচ খেলুক। তাতে তোমার টাকাও উঠবে আর ওদের নেট প্র্যাকটিসও হবে।

লাটগিন্নী খুব খুশি। বললেন, ভেরি গুড আইডিয়া। ব্রজদা ইউ আর লাভলি।

বাস এক কথায় ঠিক হয়ে গেল। এম সি সি ভার্সাস গবর্নেসেস্ ইলেভেন।

যদুদা জিজ্ঞেস করলেন, গবর্নেসেস্?

ব্রজদা বললেন, গবর্নরস্ ওয়াইফ ইজিকলটু গবর্নেস। তার পরে এপস্ট্রপি এস্। নেস্‌ফিল্ডের গ্রামারখানা দেখে নিস। নে এখন শোন। তারপর মাঠে ত নামলাম। ক্যালকাটা ক্লাবের মাঠে। খেলার সুরুতে ছিল গোটা কতক ক্লাব মেম্বার আর দিশি রাজা মহারাজা খেতাবধারীর দল। মোস্ট অব দি মাঠ ফাঁকা। তেমন টিকিট বিক্রি হল না দেখে লাটগিন্নী একটু



ডান হাতে ফাষ্ট বল, বাঁ হাতে স্পিন

মনক্ষুণ্ণ হলেন। যা হোক খেলা সুরু হল। তাড়াতাড়িতে টীম জোগাড় করেছি। উইকেট কীপার অব্দি নেই। জার্ডিনের লাকটা ভাল। টসে জিতে ব্যাটিং নিলে। কি আর করি, আমিই ষ্ট্যাম্পের পিছনে দাঁড়ালাম। একটার পর একটা ছোকরাকে বল করতে ফিল্ডে পাঠাই আর জার্ডিনের ব্যাটসম্যানরা তাকে পেঁদিয়ে বিন্দাবন পাঠায়। একশ 'বার মিনিটে ওরা পঁচানব্বই ফর নো উইকেট করলে। বেইজ্জতির একশেষ! আমি আর থকেতে পারলাম না। একটা আনাড়িকে প্যাড পরিয়ে উইকেট কিপিং-এ পাঠিয়ে নিজেই বল হাতে নিলাম। জানিস ত আমি দু হাতেই বল করতুম। ডান হাতে ফাষ্ট বল দিতুম আর বাঁ হাতে স্পিন। কার সাধ্যি খেলে। যা হোক ওভারের প্রথম বলেই লেগ ব্রেক। ব্যাটসম্যানের ডান পায়ের প্যাডে ঠক্ করে বলটা লাগতেই সে ব্যাটা. ওফ্ ফাদার

বলে ক্রীজের উপর শুয়ে পড়ল। হেঁটে আর প্যাভিলিয়নে যেতে পারলে না। রিয়েল লেগ ব্রেক কিনা।

সেকেণ্ড বল দিলাম গুগলি। অফ ষ্টাম্প ছিটকে পড়ল। পর পর দু বলে দুজন আউট হতেই দেখলাম গ্যালারির সবাই নড়েচড়ে বসল। মৃদু হাততালিও পড়ল। কিছুক্ষণ পরে দেখি জার্ডিন হোঁৎকা মতন এক ব্যাটসম্যান পাঠিয়েছে। সে ত বেশ পোজ নিয়ে ক্রীজে ব্যাট ট্যাট ঠুকে খুঁটি গেড়ে দাঁড়ালে। দেখেই বুঝলাম ব্যাটা খুব তুখোড়। শুধু গুগলিতে কাবু করা যাবে না, বড় শামুক লাগবে। ব্যাট ধরা দেখেই বোলাররা বুঝতে পারে, ব্যাটসম্যানদের দুর্বল স্থানটা কোথায়। দেখলাম বেটা পা দিয়ে লেগ ষ্টাম্প কভার করেছে আর ব্যাট দিয়ে অফ আর মিডল স্টাম্প। পরপর দুটো বল কোন ক্রমে ঠেকিয়েও দিলে। নো রান। ঘাঘু ব্যাটসম্যান, মার দেখেই বুঝলাম। আচ্ছা বাবা, তুমি যদি বুনো ওল ত আমি এই ব্রজরাজ কারফর্মাও হলাম গে বাঘা টামারিন। কুড়ি স্টেপ পিছিয়ে গেলাম তারপর ঝড়ের গতিতে ছুটে এসে এক্সট্রা ফাস্ট বলের সঙ্গে লেগ স্পিন মিলিয়ে অফ ষ্টাম্পে ঝুলিয়ে দিলাম ছুড়ে। চোখের পলক না পড়তে সিলি মিড অফে বলটা ড্রপ খেয়েই তীব্র গতিতে মোড় নিয়ে লেগ ষ্টাম্পের দিকে বোঁ করে ঘুরে গেল। ব্যাটসম্যান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কোনক্রমে কভার করতে গেল। পরমুহূর্তেই দেখলাম বাছাধন লাট্টুর মত পিন পিন করে স্পিন খেতে খেতে সর্ট ফাইন লেগে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। ঐ স্পিন কি আটকান সোজা কথা! ব্যাটসম্যান নিজেই স্পিন করে গেল। আর বলটা ব্যাটের কোনায় ঠেকে গালিতে ইজি ক্যাচ তুলে একেবারে ফিল্ডারের বুক পকেটে ঢুকে পড়ল। টিপখানা দেখেছিস আমার। ক্যাচ মিস করা আমাদের জাতীয় অব্যেস কি

না, তাই কোনরকম রিস্ক নিলাম না। তারপর ওঃ, সে কি হাততালি। আমার প্রথম ওভারের রেজাল্ট হল থ্রি উইকেটস নো রান।

ওয়াটার রিসেস হতেই জার্ডিন সাহেব, লাটগিন্নী ছুটে এসে আমার সঙ্গে সে কি হ্যাণ্ডসেক। প্রাইভেট সেক্রেটারি লাটগিন্নীর আদেশে লাটসাহেবকে ফোন করতে ছুটলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে রটে গেল জবর খেলা সুরু হয়েছে। মাঠে ভিড় বাড়তে লাগল। বাইরে গুঁতোগুঁতি। নিমিষের মধ্যে সব টিকিট নিঃশেষিত। গেট পাস নিয়ে নিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট সুরু হল। সে এক এলাহী কাণ্ড।

লাঞ্চের আধ ঘণ্টা আগেই কোন রান অ্যাড না করে জার্ডিনের দল ঐ পঁচানব্বইতেই আউট হয়ে গেল। স্কোর বোর্ডের বোলিং এনালিসিসটা দিচ্ছি তার থেকেই রেজাল্টটা জানতে পারবি। বি কারফর্মা সেভেন ওভার ফাইভ মেডেন নো রান টেন উইকেটস।

সুনীল ফস করে বলে উঠল, তা আবার কি করে হয়। এই বলছেন নো রান, আবার বলছেন সেভেন ওভার, ফাইভ মেডেন।

ব্রজদা বললেন, তোদের কাছে হয় না, ব্রজর হাতে সবই হয়। এখন শোন। বকবক করিস নি।

আমরা এবার ব্যাট করতে নামলাম। লাঞ্চের আগে মাত্র তেইশ রাণে আমাদের চারটে উইকেট ঝপ ঝপ করে পড়ে গেল। লাঞ্চের পরে মাত্র সাত রান হতে আরও একটা পড়ল। সিক্‌স্‌থ ম্যান নামলাম আমি। ওদের বাঘা বোলারকে ফেস করলাম। সে বল ছুঁড়লে। সেটা ছিল ইন সুইঙ্গার। বল মাটিতে পড়ার আগেই দৌড়ে গিয়ে সর্ট লেগ থেকেই মারলাম একখানা ছয়। বল মাঠ পেরিয়ে লাট সাহেবের বাগানে গিয়ে

পড়ল। নতুন বল আনা হল। ঘষে ঘষে তার রঙ চটিয়ে বোলার আবার ছুঁড়লে। অফ ব্রেক। মাথার উপর দিয়ে প্যাভিলিয়নের ছাতে পাঠিয়ে দিলাম। আবার ছয়। ফাষ্ট ওভারের ছটা বলেই আমার ছত্রিশ রান হল। নেক্‌স্‌ট্‌ ওভারে মাত্র দু রানে আমাদের আরও একটা উইকেট গেল। তারপরের ওভারে আমি আবার ছত্রিশ রান করলাম। আমার বাহাত্তর রান নিয়ে মোট রান হল একশ চার ফর সিক্স। পরের



আমিও ঝাড়লাম জাম্পার

ওভারে একেবারে কেলেঙ্কারি। কোন রান না হতেই আরও একটা উইকেট গেল। তারপর আমি আবার ফেস করলাম। বোলার প্রবল বিক্রমে ছাড়লে একটা বাম্পার। আমিও ঝাড়লাম জাম্পার। আমার সঙ্গে চালাকি! লাফিয়ে উঠে এইসা এক তাড়ু মার মারলাম যে বল সোজা উপরে গিয়ে আকাশের

নিলীমায় একেবারে বিলীন হয়ে গেল। পুরো দশ মিনিট সকলের চোখ উপরে। রিপোর্টারের কলমে কালি সরল না, ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলল না। সব হাঁ হয়ে গেছে। মাঠে পিন ড্রপ সাইলেন্স। শুধু খুব দূর থেকে, বোধ হয় চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার কোলের কাছ থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেতার তরঙ্গে ভেসে উঠতে লাগল। বিপ্ বিপ্ বিপ্। তোরা আজকালকার ছোকরা কীথ মিলারের মারের বড়াই করিস! আরে আমি ছিলাম মিথ কীলার।

হ্যাঁ, তারপর সুরু হল ক্ল্যাপিং। অবিচ্ছিন্ন ধারায় হাততালি পড়তে লাগল। তারপরে সমস্যা হল, এইবারে কত রান দেওয়া হবে। এটা কি বাউণ্ডারি, না ওভার বাউণ্ডারি, না সুপার বাউণ্ডারি, না কি। পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করা হল বলটা পড়ে কিনা দেখার জন্য। কিন্তু কোথায় বল। যাক শেষ পর্যন্ত ব্রজদাস্ পাজ্‌ল্ নাম দিয়ে ওভার বাউণ্ডারির পয়েন্টই লিখলে।

খেলাও আবার শুরু হল। নেকস্ট্ বলে আরেকটা পাজ্‌ল্। সেটা আরও মোক্ষম। না, এবার আর আকাশে নয়, মারের চোটে বলটা ফট করে নারকোলের মালার মত দু টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। আর্ধেকটা একজন ফার্ষ্ট স্লিপে ক্যাচ ধরে ফেললে আর বাকি আর্ধেকটা ওভার বাউণ্ডারি হল। আবার খেলা বন্ধ করে কনফারেন্স বসল। কী করা হবে এখন। আমি কি আউট হয়েছি, না ছয় মেরেছি? ফয়সালা আর হয়ই না। খেলতে গিয়ে বারবার এই ডিষ্টার্বেন্স। কার ভাল লাগে বল। এদিকে তখন আবার আমার ইভনিং ডিউটি। সময় হয়ে গেছে। দুত্তোর বলে ব্যাট ফেলে দিয়ে অফিসে চলে এলাম। পরে শুনলাম, জার্ডিন সাহেব নাকি বলে গেছেন, ইণ্ডিয়া একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দলকে হারাবে। ঐ এক খেলাতেই তাঁর চোখ ফুটেছিল বুঝলি।

আট

আমাদের বিশু, প্রেস ফটোগ্রাফার বিশ্বম্ভর তরফদারকে আপনারা চেনেন ?

চিনতে পারছেন না। তবে চিনবেন শিগগিরই। কলকাতার প্রেস ফটোগ্রাফারদের মধ্যে বয়সে সব থেকে তরুণ হলেও, ক্রিয়াকর্মে খুবই তুখোড়। যাকে বলে রাইজিং ফটোগ্রাফার। স্পুটনিকও বলতে পারেন। চড়চড় করে উঠছে।

বিশুবাবু ফটো তুলতে ওস্তাদ। তবে কাবু হয়ে পড়েন ক্যাপসন লিখতে। যে আঙ্গুল অ্যাপারচার ঠিক করতে অভ্যস্ত, সেই আঙ্গুলে কলম ধরতে যাওয়া একটা মস্ত ডিপারচার ত। তাই বিশুকে বারবার সুনীল বোস আর সুনীত ঘোষের দ্বারস্থ হতে হয়। এবং এই সুযোগে সুনীল এবং সুনীত প্রাণ খুলে তাকে লেকচার দেয়। প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিবারেই এক। ফটোগ্রাফার যত বড়ই হোক রিপোর্টারদের তুলনায় তারা নিকৃষ্টতর জীব !

কাজটি হাসিল করা দরকার, তাই বিশু তরফদার এতকাল এদের আপ্তবাক্য হাসি-হাসি মুখ করে শুনে গেছে।

সেদিনও বিশু তরফদারকে সুনীত ঘোষের দ্বারস্থ হতে হল। কলকাতার ফ্যাশানেবল্ পাড়ার আস্তাকুঁড়ের ছবি তুলে এনেছে !

ক্যাপশনে এখন হিউম্যান টাচটি দিতে হবে। তাই সুনী হাতে ছবিখানা তুলে দিল।

সুনীত ঘোষ প্রিন্টখানি হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখল। তারপর তৈরী হল। ক্যাপশান লিখতে নয়, লেকচার দিতে।

সুনীত বললে, দেখুন বিশুবাবু আপনারা ফটোগ্রাফাররা বড় পরাধীন। যতই আপনারা ইয়ে করুন না কেন, স্ট্যাটাসের দিক দিয়ে।

বিশু এই প্রথমবার চিরাচরিত প্রথাটি ভাঙল। বললে, দেখুন মশাই, কথায় কথায় স্ট্যাটাস্ দেখাবেন না। আমরা, ফটোগ্রাফারস্ অব্ দি ওয়ার্লড, এখন আর হেজিপেজি লোক নই, খোদ মহারাণীর বড় কুটুম, তা জানেন। রিয়েলি দাদা বড় আফশোষ হয় এখন, সাত সকালে যদি বিয়েটা না করতুম তাহলে অ্যা ঃ —

রানীর বোনাই হতিস্! ইডিয়েট!

চেয়ে দেখি ব্রজদা। বিরক্ত মুখে দরজা ঠেলে ঢুকে যদুদার সামনে গিয়ে বসলেন।

বললেন, তোদের আজকালকার জেনারেশনটা বড্ড হ্যাংলা হয়ে পড়েছে। আমাদের আমলে, সেই নাইনটিন ফোর ফাইভে, আমরা মানুষ হিসেবে অনেক বেশি সরেশ ছিলুম, বুঝলি। আর ছিলুম বলেই অ্যাডমিরাল হিগিনবিগিন, ডিউক অফ নোম্যানস্-ল্যাণ্ডের জামাই হবার প্রস্তাবটা অমন হেলায় প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলুম। লর্ড হিগিনবিগিন যে সে লোক নন। স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জের মেজো ভায়রার ছোট ভগ্নিপতি। তার উপর রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভির বড়কর্তা। ব্যাটার পিরেন প্যাণ্টালুনে অব্দি রয়েল ব্লাড অমাবস্যে পূর্ণিমায় জোয়ার ভাঁটা খেলত। তাঁরই ওনলি ডটার, লেডি পমেটম। আর কে জানত, এক বাঙ্গালী ফটোগ্রাফারই শেষ পর্যন্ত তাঁর—

ব্রজদা হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে বার কয়েক হেঁচে উঠলেন। তারপর চুপচাপ সিগারেট টানতে লাগলেন।

সুনীত বলে উঠল, কি হল ব্রজদা?

ব্রজদা নাক মুছতে মুছতে বললেন, সর্দি।

সুনীত বিনয়ে অবনত হয়ে বলতে লাগল, না মানে ঠিক আপনার কথা, মানে আপনার সর্দির কথা, অবিশ্যি হাঁচিটা সর্দিরই একটা রূপ, কিম্বা সর্দিরই ঢেউ, কিন্তু আমি, আমরা এখন, এই-মুহূর্তে, ঠিক আপনারা সর্দির কথা জানতে চাইছি না। জানতে চাইছি সেই বাঙ্গালী ফটোগ্রাফারটির কি হল?

ব্রজদা এক কথায় সেরে দিলেন, তোমাদের সেই বাঙ্গালী ফটোগ্রাফারটিও এই আমিই।

সুনীতের মুখ এমন হাঁ হয়ে গেল যে তার ভেতর থেকে আর কথা বের হল না।

সুনীল বোস বললে, সুনীত বাবুটা যেন কি রকম। ব্রজদা যে বিলাত থেকে ফটোগ্রাফিতে ডিগ্রি এনেছেন, তা বুঝি জানেন না।

ব্রজদা একগাল অমায়িক হাসি বাজারে ছেড়ে বললেন, তুই বড় তিলকে তাল করিস সুনীল। আমাদের আমলে বিলাত যাওয়া কি অত সোজা ছিল রে। ফটোগ্রাফির বিষয়ে যা কিছু আমার শেখা সবই এই কলকাতায়। ছ্যাখ সুনীল, একটা উপদেশ দিই, জীবনে যদি সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা অর্জন করতে চাস ত কক্ষনো গুল মারিস নে। মনে রাখিস, সত্যের চেয়ে অবিশ্বাস্য আর কিছুই নেই।

তবে হ্যাঁ, ব্রজদা বললেন, ফটো তোলা শিখেছি খাস সাহেবের বাচ্চার কাছ থেকেই। সে কি আজকের কথা!

তবে বলি শোন। জনস্টন হপমানের নাম শুনেছিস? চৌরঙ্গীতে ছিল তাঁর জমকালো ফটোর দোকান। সেই দোকানের

চিফ ফটোগ্রাফার ছিল আমার ওস্তাদের ওস্তাদ। আমার ওস্তাদ ছিল কলকাতার সেরা সোসাইটি ফটোগ্রাফার। মিঃ স্যামুয়েল সমসের জঙ্গ বাহাদুর। এক ডাকে সবাই চিনত। তাঁর হাতেই আমার তালিম।

যা ব্বাবা, বিশু বলে উঠল, এই যে বললেন খাস সাহেবের কাছে তালিম নিয়েছেন। নাম শুনে ত খাসা সাহেব বলেই মনে হচ্ছে।

ব্রজদা বিশুর দিকে কটমট করে চাইলে।

বললেন, কানটা পরিষ্কার করাস বিশে, নইলে স্টেটবাসের যে রকম দৌরাত্ম্য। তলায় পড়তে বিলম্ব হবে না। বললুম কি, আর শুনলি কি। সাহেবের কাছ থেকে শিক্ষা নেবে ব্রজ! অমন ঢের সাহেবকে সে বগলের তলা দিয়ে গলিয়ে দিয়েছে। আমার ওস্তাদ ছিল 'খাস সাহেবের বাচ্চা'। আর এদেশে সাহেবের বাচ্চারা যে কখন কোথা দিয়ে ফুটে বেরোয়, হিসেব রাখা মুস্কিল। তা সাহেবরাও জানে না। আমার ওস্তাদের মা সাহেবের বাড়ির আয়া ছিল। যা বলি শুনে যা।

সে আমলে তোদের এই ব্রজদার কাছে ফটো তোলাতে লাট বেলাটের বউ মেয়ে এসে ভিড় করত বুঝলি। ভাইসরয়ের গিন্নী কত সাধাসাধি করেছে বড় লাটের খাস ফটোগ্রাফার হবার জন্য। সে প্রস্তাবও হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছি। তোরা হলে ত ল্যাল ল্যাল করে ছুটতিস। তবে তোদের ব্রজদা ত আর তোরা নয়, সে অন্য মেটেরিয়েলে গড়া। তাই গোলামী না করে স্বাধীন ব্যবসায়ে মন দিয়েছিলুম। ছদিনেই পসার জমে উঠেছিল।

কি বলব ভাই দোকান খুলতুম সকাল দশটায় আর বন্ধ করতুম রাত আটটায়। আর এর মধ্যে তিলার্ধও বিশ্রামের ফুরসৎ পেতুম না। দিশি বিলিতি অপ্সরা কিন্নরীর দল সব সময়

আমাকে ঘিরে থাকত। তখন আমার ইয়ং বয়েস। পাট্টাই জোয়ান। একটু এদিক ওদিক হলেই যে কি হত বলা যায় না। একে কাঁচা বয়েস, তার উপর তোদের ব্রজদার রূপ তখন চেকনাই ছাড়ছে। কত খুব-সুরৎ লেডির যে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছি, তার হিসেব নেই। লেডি পমেটম কি বলেছিল জানিস ?

আমাদের পক্ষে সেটা জানা সম্ভব ছিল না। তাই চুপ করে রইলাম।

ব্রজদা নিজেই জানালেন। বললেন, লেডি পমেটম একদিন আবছা অন্ধকারে আমার তুটো হাত চেপে ধরে গদগদ স্বরে বলেছিল, ব্রজদা, ব্রজ, মাইডিয়ার ব্র, তুমি হিরো। তোমাকে দেখলেই আমার সেকসপীয়রের হিরোর কথা মনে পড়ে। ঠিক যেন মূর্তিমান ওথেলোটি।

যা চান্স পেয়েছিলাম না, ব্রজদা টেবিলে চাপড় মেরে বলে উঠলেন, আমি বলে তাই সামলে নিয়েছি। এই বিশু টিশুর মত চ্যাংড়া হলে সে অবস্থায়—যাক সে কথা আর বলতে চাইনে।

বিশুর দিকে চেয়ে ব্রজদা বললেন, প্রিন্সেস মার্গারেটকে বিয়ে করছে লণ্ডনের এক সোসাইটি ফটোগ্রাফার আর কলকাতায় আমাদের বিশুবাবু ক্যামেরা ঘাড়ে করে ছাগলের সেজ ছেলের মত লাফাতে লেগেছেন। ইংরেজ ছেলে—

আমি বাধা দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, ছাগলের সেজ ছেলে ত বুঝলাম না।

তা বুঝবে কেন ? ব্রজদা বিরক্ত হলেন। ওটা যে দিশি জিনিষ। যদি ছাগল না বলে ক্যাঙারু কি পেরুর কথা বলতুম ত পরিষ্কার বুঝে যেতে। পাশ্চাত্য শিক্ষা দেশের কী সর্বনাশটাই না করেছে ! বলি ছাগল চেনো ?

ভয়ে ভয়ে বললাম, তা বোধ হয় চিনি।

বাস, তবে আর কি। মধ্যে মধ্যে ছাগলের যে এক্সট্রা বাচ্চা হয় জানো? দুটোর জায়গায় তিনটে? এদিকে মায়ের ত দুটি বাঁট। বড় আর মেজ যখন সে দুটো দখল করে ঢুঁ মেরে মেরে দুধ খায় তখন এই সেজ বৎসটি কি করে? অন্য দুটোর খাওয়া দেখে আর তিড়িং তিড়িং লাফায়। এই আমাদের বিশুবাবু যেমন রাণীর বোনাই হবার আনন্দে লাফাচ্ছেন।

আরে এ-ও ইংরেজ ও-ও ইংরেজ। ওদের মধ্যে বিয়ে হচ্চে, তা নিয়ে এত নাচানাচি করার কি আছে। বরং আমার ব্যাপারটা নিয়ে যে হৈ চৈ হয়েছিল তার তবু একটা মানে ছিল। কারণ রয়েল ফ্যামিলির মেয়ের সঙ্গে ফাটাগ্রাফারের বিয়ে সেই প্রথম. ইংলণ্ড এবং ভারত, দুটোর ইতিহাসেই সেই প্রথম, পাকিয়ে ওঠে। এই মার্গারেট ফার্গারেট এখন যা করছে, এতে ত আর নতুনত্ব কিছু নেই। আমার স্টোরিটাই টুকে মারছে। লেডি পমেটমের রক্তও ছিল খাঁটি ইম্পিরিয়াল কোয়ালিটির, মেড-ইন-ইংলণ্ড। আর এই ব্রজরাজ কারফর্মার দেহে ছিল গ্যারান্টি দেওয়া স্বদেশী ব্লাড। এই দুই রক্তে যখন তুফান উঠল, মানে প্রেমের তুফান, তখন ত প্রায় রক্তারক্তি হবার জোগাড়।

তাহলে ব্যাপারটা বলি শোন।

আমার পসার তখন তুঙ্গে। দিনরাত অপরূপ সব সুন্দরী এসে স্টুডিওতে সিটিং দিচ্ছে। কল দিচ্ছে বাড়িতে। নিয়ে যাচ্ছে পার্টিতে, বোটানিক্সে, ডায়মণ্ড হারবারে দার্জিলিঙে, সিমলেয়।

ব্রজদা ব্রজদা করে কলকাতার তাবৎ সুন্দর মুখ পাগল হয়ে উঠেছে। মানে ফটো তোলার জন্যে। স্টুডিওর ওয়েটিং রুমে

সর্বদা বিউটি কুইনদের গাঁদি লেগে থাকত। দিনরাত নাড়াচাড়া করে সুন্দরী মেয়ের উপর অরুচি ধরে গেল। এক জিনিষ আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়, বল। শেষে বিরক্তিও ধরে গেল। স্বপ্নে পর্যন্ত সুন্দরী মেয়ের চেহারা দেখলে চোঁয়া ঢেঁকুর উঠতে লাগল।

ছাখ বিশু, ব্রজদা সস্নেহে বললেন, কুলিগিরি করে খাস সেও ভাল, কিন্তু খবরদার, সোসাইটি ফটোগ্রাফার হ'স নে। অম্লশূলে মরবি। অত রোজগার করা সত্ত্বেও সাধে কি আর ও প্রফেশন ছেড়েছি। আজ যদি তোদের ব্রজদার স্টুডিও থাকত, তাহলে আর কোন মিঞাকে এই কলকাতায় সাটার টিপে করে খেতে হত না। তা বাবা এখন খাসা আছি, রাতদিন যে মেয়েদের মুখে চোখ রাখতে হচ্ছে না, এই বাঁচোয়া।

হ্যাঁ রে, সুনীল, তুই কি কখনও বাড়ি বাড়ি দুধের জোগান দিতিস ?

আচমকা প্রশ্নে সুনীল থতমত খেয়ে গেল।

বলল, আমি ? দুধের জোগান ? কই না ত। আমি দুধ বেচতে যাব কেন ? কি যে বলেন। যাঃ।

তবে নিশ্চয়ই তুই সোসাইটি ফটোগ্রাফার ছিলি।

না না, কক্ষণো না। সুনীল তীব্র প্রতিবাদ করে।

ব্রজদা দৃঢ়স্বরে বললেন, নিশ্চয়ই ছিলি। এ জন্মে না হলেও আর জন্মে ছিলি। নইলে বিয়ে থা করছিস নে কেন ? মেয়েদের সম্পর্কে এত বিতৃষ্ণা তোর হল কি করে ? মেয়েদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণা এক হয় গয়লাদের। দুধের রোজ দিতে গিয়ে রোজই সাত সকালে মেয়েদের ঘুম-ভাঙা পেটেণ্ট লেদারি মুখ দেখতে হয় বলে; আর হয় ফ্যাশানেবল্ ফটোগ্রাফার কিম্বা ইদানীংকার্ সিনেমা পত্রিকার "ফটো শ্রীঅমুকদের"। দিন রাত তারকাদের পিছনে ঘুরতে হয় বলে। কারণ যেই অমুক তারকা "বিশ্রামের অবসরে

প্রিয় বাঁদরকে কলা খাওয়াইতেছেন, পাশে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি," কিম্বা অমুক শ্রীমতীর মুখে "চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে," কিম্বা কোন বিলাসিনী নাইলন সাড়ীতে শরীরকে সরব করে "গৃহ-বধূর কর্তব্য করিতে রান্নাঘরে পুঁইশাক বন্ধনে ব্যস্ত" থাকেন, অমনি সেই মুহূর্তটিকে "ক্যামেরায়িত" করতে হামেশা সাটার টিপতে হয়তো। কাজেই তাদের চোখে অনবরত তারা-ফুল ফোটে। পরম রমণীয়রাও চরম হয়ে ওঠে।

আমার পসারটি জাঁকিয়ে ওঠার এক বছরের মধ্যেই আমার অবস্থাটিও এমন চরম হয়ে উঠেছিল।

ব্রজদার স্বর ক্রমেই সিরিয়াস হয়ে উঠল।

বললেন, এক দুর্বিসহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলাম। এমনি সময় একদিন বাইরে "আউট" লাগিয়ে ভিতরে চুপচাপ বসে আছি। দার্জিলিং থেকে কল এসেছে। স্বয়ং ভাইস্‌রয় গিন্নীর অনুরোধ। গেলে অনেক টাকার কাজ হবে। অথচ কোন উৎসাহ পাচ্ছিনে। ভাইসরয় এখন দার্জিলিং'য়ে। তার মানে গোটা সোসাইটিই ওখানে। বসে বসে ভাবছি, কি করা যায়। এমন সময় হুড়মুড় করে লর্ড হিগিনবিগিন স্টুডিওতে ঢুকে পড়লেন। সারা গায়ে রয়েল নেভির মেডেল আর ডেকোরেশন।

হিগিনবিগিনের সঙ্গে মৌখিক আলাপ আমার হয়নি। বড় লাটের পার্টিতে বার কয়েক ওকে দেখেছি। রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভির অ্যাড্‌মিরাল হয়ে বছর খানেক হল ইণ্ডিয়াতে এসেছেন্। ভাইসরয় গিন্নীই আমাকে বলেছিলেন লর্ড সাহেব মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের পরমাত্মীয়। ডিউক অব নোম্যান্‌সল্যাণ্ড। আরও কত কি? আলাপও করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বাট্ আই রিফিউজ্‌ড্।

দুদিন ধরে হিগিনবিগিনের সেক্রেটারী আমার কাছে আসছে ওর একটা বার্থ ডে পোর্ট্রেট তোলাবার জন্য। কিন্তু আমার

এনগেজমেন্ট ডায়েরি এক মাসের মত ভর্তি। তাই সময় দিতে পারিনি।

হিগিনবিগিন হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আমার কাছে এগিয়ে এলেন।

তারপর অভদ্র ভাষায় বললেন, তুমিই কারকর্মা। তোমাকে আমার সেক্রেটারী দুদিন ডাকতে এসেছিল, যাওনি যে বড়।

ব্যাটার এই চোয়াড়ে ব্যাভার দেখে আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। তবু অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করে বললাম, আমার খুশি। তা ছাড়া, শুনলাম তোমার পোর্ট্রেট তুলতে হবে, তাই শুনে আমার ক্যামেরা ভড়কে গেল।

হিগিনবিগিন আমার কথা শুনে বোমকে গেলেন।

তার মানে ?

বললাম, লড সাহেব, মানে নিতান্তই সরল। এই পোর্ট্রেট-গুলো দেখছ তো।

বলেই একেলে উর্বশী মেনকা রম্ভা ভেনাসদের মুখচ্ছবিগুলো দেখিয়ে দিলুম। বললুম, ভাল করে আগে এগুলো দেখ।

দেখলুম, হিগিনবিগিন বেশ করে ফটো গুলো দেখছেন। দেখা হল।

বললেন, হ্যাঁ, দেখলুম। তারপর ?

বললাম, নাউ লুক অ্যাট্ দ্যাট্ মিরর্।

ব্যাটা তাও দেখলে। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে। ঘোড়ার মত মুখ, উটের মত নাক, ভোঁদড়ের মত চোখ, কান দুটো যেন বাতাবি লেবুর পাতা। আর খ্যাংরা কাঠির মত গোফ। থুতনির নিচ থেকে যেন বিচে কলার মোচা বেরিয়েছে ? এই ত ছৈরৎ। তার আবার পোর্ট্রেট! কিন্তু কি জাঁহাবাঁজ সাহেব! যেন কিছুই বোঝেনি।

বললেন, দেখলাম। তারপর।

এর পরেও আবার "তারপর" বলে! বুঝে দেখ। কিন্তু আমিও ত তোদেরই ব্রজদা।

বললাম, ছাখ লর্ড সাহেব, যে ক্যামেরা এই সব ফ্যান্সি মুখের ছবি তুলতে অভ্যস্ত তা যে তোমার ঐ জু গার্ডেনের ছবি তুলতে ভড়কে যাবে, এতে আর আশ্চর্য কি? আমার আবার খুব দামী, জার্মান ক্যামেরা ত, লেন্সটা অতি মাত্রায় সেন্সিটিভ।

ব্যস্, তাবপরেই ঘরে যেন অ্যাটম্ বোমা ফাটল। বাজখাই গলায় চোস্ত ইম্পিরিয়াল লব্জে রয়েল গালাগাল দিতে দিতে



বললে, উড়িয়েই দেব—

ফস্ করে দুটো রিভলবার বের করে একটা পেটে আর একটা বুকে চেপে ধরলে। বললে, উড়িয়েই দেব শালাকে। ভাবলাম, হয়ে গেল। আমি মন স্থির করে কায়মনবাক্যে বন্দেমাতরম্ জপ

করতে লাগলাম। কারণ, আমাদের সেকালের পেট্রিয়টদের তাই ছিল দস্তুর। বিপদে পড়লেই বন্দেমাতরম্। যায় যাবে জীবন চলে, বন্দেমাতরম্ বলে। কত ছেলে এই মন্ত্র জপে হাসতে হাসতে ফাঁসিতে চড়েছে সে আমলে। বেঁচে থাকলে অবিশ্যি পি ডি অ্যাক্টের আসামী হয়ে ফাটক খাটতে হত। শহীদ হয়ে হিস্ট্রিতে এখন অমর হয়ে গেছে। লেখা পড়া ছেড়ে কত ছেলে বন্দেমাতরম্ বলতে বলতে তখন জেলে গিয়ে ঢুকেছে। এমনিতে হয়ত গো মুখ্যু হয়েই থাকত, কিন্তু স্রেফ এই মন্ত্রের জোরেই তাদের অনেকে দেশ স্বাধীন হবার পর এডুকেশন মিনিস্টার অব্দি হয়ে গেছে। বন্দেমাতরমের কি সোজা এফেক্ট রে!

ব্রজদা এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরালেন। গোটা কয়েক সুখটান দিয়ে যেন একটু দম নিলেন।

তারপর বললেন, পেটে বুকে রিভলবার ঠেকিয়ে দুশমনটা ফোঁস ফোঁস করে গজরাচ্ছে আর আমি চোখ বুঁজে পরিত্রাহি বন্দেমাতরম্ জপে চলেছি। বললে বিশ্বাস করবিনে, একেবারে হাতে হাতে ফল। যেমন ভাবে ফস্ করে রিভলবার দুটো বের করেছিলেন আবার তেমনি ফস্ করে সে দুটো পকেটে পুরে ফেললেন।

দাঁত কিড়িমিড়ি করে বললেন, না, মারলে হবে না। ওকে মেরে ফেললে আর ফটো তুলবে কে? ওকে দিয়ে আমার গুষ্টির ফটো তুলিয়ে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। আমার দিকে চাইলেন না পর্যন্ত। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেরিয়ে চলে গেলেন। মনে মনে হাসলাম। ভাবলাম, করবি আমার কচু। আমিও সেই রাত্রেই দার্জিলিং রওনা দিলাম।

আর শিলিগুড়ি স্টেশনে নামতেই দেখা হয়ে গেল অপূর্ব এক লাবণ্যের সঙ্গে। একেবারে চোখাচোখি। মেয়ে নয় ভাই, সে মেয়ে নয়। মেয়ে আমি কম দেখিনি। মেয়ে দেখলে আমার কোন রি-অ্যাকশন হয় না। সুন্দরী বললে তাকে কিছুই বোঝান যায় না। কারণ সুন্দর মুখ দেখলেই আমার চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে। কিন্তু এ-যে প্যাস্তুরাইজড্ মাখন। গ্যাস্টিকের রুগীর পথ্যি!

ব্রজদা দম নেবার জন্য একটু থামলেন। বললেন, মেয়েদের তাবৎ ভালোর সবটুকু তুলে নিয়ে তা থেকেই এই মাখনটুকু যেন তোলা হয়েছে। তাই এর মধ্যে কমনীয়ত্ব, নমনীয়ত্ব, রমনীয়ত্ব পুরোমাত্রায় আছে অথচ অনিয়নত্ব ছিটে ফোঁটাও নেই।

সুনীত ঘোষ বললে, অনিয়নত্ব কি ব্রজদা?

ব্রজদা বললেন, তুই না খুব ইংরিজিনবিশ। অনিয়ন চেনো না? পেঁয়াজ? তার থেকেই অনিয়নত্ব, অর্থাৎ পেঁয়াজি। হ্যাঁ, যা বলছিলুম। স্পেশাল কোচ্ থেকে সে নামছিল। সেই মুহূর্তে চোখাচোখি হল। তারপরই কি বলব ভাই আমার শরীরে পুলকের বান ডাকল। মুহূর্তে মলয় পবন ফুর ফুর ক'রে পাক মেরে গেল। পরক্ষণেই বুঝি এ ভরা বাদর মাহ ভাদর এসে পড়ল। হিরো হিরোইন লভে পড়লে তোদের এখনকার হিন্দী সিনেমায় যেমন নানা দৃশ্য ফুটে ওঠে, জানলার ধারে চাঁদ লটকে যায়, লেকের জলে ফুড়ুং ফুড়ুং পদ্ম ফোটে, কোকিল ভ্রমর কুহু কেকা মত্ত দাদুরি, বালসারার ইউনিভক্স ইস্তক লতা মঙ্গেশকর যেমন প্লে ব্যাকে গান জুড়ে দ্যায় ঐ কছমের একটা হ্যাড্ডা ব্যাড্ডা হয়ে আমার মনটারও সারা গায়ে অপুর সংসারের দিওয়ানা অপুর মত দাড়ি গজিয়ে গেল।

মনটা ফিক ফিক করে এই হাসে আবার হুস্ হুস্ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বুঝলুম লভ্ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট হলে যা হয় তাই

হয়েছে। যাকে বলে পিওর ফার্স্ট-সাইটিস। বড় শক্ত ব্যামো। যখন হুঁশ হল দেখি কেউ কোথাও নেই। প্ল্যাটফরম ফাঁকা। দার্জিলিঙের ছোট রেল ততক্ষণে মহানন্দার ব্রিজ পেরিয়ে গেছে।

আর ফার্স্ট সাইটের ধকল সামলাতে না পেরে আমি একা শূন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি।

হঠাৎ 'সাব' শুনে চমকে চেয়ে দেখি সামনেই এক উর্দী পরা পাহাড়ি আর্দালী সেলাম জানাচ্ছে।

বললে, কারফর্মা সাব?

বললুম, ইয়েস, কারফর্মা স্পিকিং?

আমার ইংরেজি শুনে ব্যাটা আরও দুটো স্যালুট দিলে। আমি সাহেবদের সামনে পারতপক্ষে ইংরেজি বলিনে। পিওর মাদার টাং-ই চালাই। তোমার অসুবিধে হয়, ইন্টারপ্রেটার রাখ। তবে ট্রেন জার্নি কি টুরে বেরুলে এ-দিশি ড্রাইভার, টাঙ্গাওয়ালা কুলি ইস্তক বাঙ্গালী চেকারের সঙ্গে সমানে ইংরাজি চালাই। ওতে সার্ভিসটা ভাল পাওয়া যায়। হাজার হোক ইংরেজ আমলে ওটা রাজভাষা ছিল ত। দিশি লোকের কাছে ওর কদরই আলাদা। কালে কালে দেখবি হিন্দিরও কদর হবে। ওটা আবার রাজেন্দ্র-ভাষা কিনা।

যাই হোক, অনেক খাতির টাতির জানিয়ে আর্দালি বললে, ওর হুজুর আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি যেন এখন সেই গাড়িতে উঠে ওকে কৃতার্থ করি। বুঝলুম, এ ছোট লাটের কীর্তি। বড়লাটের গিন্নীর আমন্ত্রণে এসেছি ত। সেটা কি করে টের পেয়েছে। এখন আমাকে একটু খাতির করতে চায়।

বললাম, ইয়েস গো।

কিন্তু তখন কি জানি, বাঘের মুখে গলা দিয়েছি। জানলাম শিলিগুড়ি ছাড়ালে, আমাকে জাপটে ধরে যখন নাকে ক্লোরোফর্মের

রুমাল বেঁধে দিলে। কোন কিছু বোঝবার আগেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আর জ্ঞান অজ্ঞানের মাঝামাঝি অবস্থায় দেখলাম সেই মন ভোলান মুখখানি আমার হৃদয়ের ডাল লেকে গণ্ডোলায় চড়ে ভাসছে। তারপরই অন্ধকার।

ক্রমে জ্ঞান হল। কিন্তু তখনও অন্ধকার। মাথা ভার ভার। হাত পা বাঁধা। বুঝলাম একটা খাটে শুয়ে আছি। কিন্তু কোথায়?

কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানিনে। হঠাৎ ক্যাঁচ কোঁচ করে দরজা খোলার শব্দ হল। হেড়ে গলায় কে যেন ইংরাজিতে বলল, তুই আগে ঢোক (আরে আওয়াজটা চেনা চেনা লাগছে যে), ঐ ছুঁচোটার মুখের সামনে ডিনার টেবিল সাজিয়ে দিবি। আচ্ছা, দাঁড়া, আমিই আলোটা নিয়ে আগে ঢুকি।

পরক্ষণেই মোমবাতি জ্বেলে যিনি ঢুকলেন তাকে দেখেই ত আমার আক্কেল গুড়ুম। লর্ড হিগিনবিগিন। এগিয়ে এলেন।

কি হে ছোকরা, এবার যাবে কোথায়?

বললাম, কি ইয়ার্কি করছেন স্যার, খুলে দিন।

হিগিনবিগিন বললেন, খুলব ত বটেই, কিন্তু আমার পোর্ট্রেটটি তোলার পর। তোর ওখানে আমাকে যে, বড় ইন্‌সাল্ট করিছিলি রাসকেল। এবার।

এবার আমি চটে গেলুম।

বললাম, এইভাবে আমাকে দিয়ে ফটো তোলাবে। কভি নেহি। জান যায়, সো ভি আচ্ছা। আমি ভাইসরয়ের গেষ্ট মনে থাকে যেন। তাছাড়া আমার হেভি ইনসিওর করা আছে। বঙ্গমাতা আমার নমিনি। আমি মলে টাকাটা স্বদেশীওয়ালারা পাবে, সেটা জান? একথা কেন বললুম, সে গল্প আরেকদিন বলব।

আমার তেজ দেখেই হোক, কি ঐ লাষ্ট কথাটা শুনেই হোক হিগিনবিগিন একটু ঘাবড়ে গেলেন।

বললেন, গ্যাখ, ইয়ংম্যান আই এপ্রিসিয়েট ইওর স্পিরিট। এস একটা রফা করা যাক। আমার ছবি না হয় নাই তুললে, আমার মেয়ের একটা পোর্ট্রেট তুলে দাও। তাতে ত তোমার আপত্তি নেই। তাহলেই তুমি খালাস।

আমার পিত্তি জ্বলে গেল ওর এটিচিউড দেখে। ফস করে বলে ফেললুম তোমারই ত মেয়ে, তার সামনেও আমার ক্যামেরা ভড়কে যাবে।

কি বললি, আমার মেয়েকে এত বড় ইন্সাল্ট। তোকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

বললুম, যাই কর আর তাই কর, তোমার গুস্টির কারো ফটোই এ শর্মা তুলছে না। এই আমার শেষ কথা।

ততক্ষণে বাবুর্চি এসে আমার নাকের ডগায় ডিনার সাজিয়ে ফেলেছে। খুব খোসবু ছাড়ছে। আহা হা চিকেন রোষ্ট! আমার পেটের মধ্যে ক্ষিধেটা গুল গুল করে বেশ জাঁকিয়ে উঠল।

হিগিনবিগিন এতক্ষণ গুম মেরে বসে ছিল। আমার ক্ষিধের প্রচণ্ডতা বোধহয় ও টের পেয়েছিল। হঠাৎ বাবুর্চিকে বললে, এই এ সব নিয়ে যা। স্রেফ দু টুকরো শুকনো রুটি আর এক গ্লাস জল রেখে যা। হিংসার পথে কিছু হবে না। ওকে অহিংসা দিয়ে কাবু করতে হবে।

এ একেবারে মোক্ষম প্যাঁচ। সকালে ব্রেক ফাষ্ট আসে, দুপুরে লাঞ্চ, রাত্রে ডিনার। নানা রকম পদ। আমার সামনে সব থরে থরে সাজিয়ে রাখে। গন্ধে ঘর ভরে যায়। পেটে খামচাখামচি সুরু হয়। জিভে জল আসে। তারপর আবার

একে একে সব নিয়ে যায়। রেখে যায় দু টুকরো শুকনো রুটি আর জল। ওঃ সে যা যন্ত্রণা, কি বলব? তবু নতি স্বীকার করিনি।

তবে একটা বড় পরিবর্তন আমার ঘটে গেল। প্রথম দিকে সেই ট্রেনে দেখা সেই মুখখানা কল্পনায় হৃদয়-রাস-মন্দিরে আবাহন করে এনে কারাক্লেশ ভুলতে চেষ্টা করতুম। ক্রমে কল্পনায় সেই মুখের বদলে চিকেন রোস্ট ভেসে উঠতে লাগল। গোড়ার দিকে আমার কল্পনার থ্রি ফোর্থে সেই মুখ আর বাকী ওয়ান ফোর্থে চিকেন রোষ্ট দেখতুম, তারপর হাফ অ্যাণ্ড হাফ এবং ক্রমশ চিকেন রোষ্টের স্বপ্নই ষোল আনা হয়ে দেখা দিতে লাগল। একী জ্বালা! অস্থির হয়ে শেষ পর্যন্ত মুরগির ঠ্যাং কামড়াচ্ছি ভেবে অন্যমনস্কভাবে হাতের দড়ি চিবোতে লাগলুম। এমনি করে চিবিয়ে চিবিয়ে একদিন হাতের বাঁধনই কেটে ফেললুম। চিকেন রোস্টকে আন্তরিকভাবে থ্যাংকস্ দিয়ে পায়ের বাঁধনও খুলে ফেললুম। ব্যস্ মুক্তি, এইবার মুক্তি। বন্দেমাতরম্।

জানি, একটু পরেই হিগিনবিগিন আসবে। রোজকার মত জিজ্ঞাসা করে যাবে আমার মতের পরিবর্তন হয়েছে কিনা! আচ্ছা, আজ এসো। ব্রজরাজের শক্তির একটু নমুনা পেয়ে যাও।

দরজার তালা খোলার শব্দ হল। এসো বাছাধন! নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। আবছা মূর্তি ঘরে ঢুকল। আজ আলো আনে নি। নতুন কোন মতলব ভেজেছে নাকি? আমার কাছে এগিয়ে এল। অন্ধকারের মধ্যেও একটা ছুরির ফলা চিকচিক করে উঠল। ছোরা মারবে না কি? এই মতলব!

জুজুৎসুর জুৎসই এক প্যাঁচে মুহূর্তের মধ্যেই আততায়ী ধরাশায়ী হল। ছোরাটা ঠন্ করে ছিটকে পড়ল। বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে তাকে জাপটে ধরলাম।

তারপর দাঁত কিড়মিড় করে বললুম, ওরে হিগিনবিগিন, সন অব এ লর্ড—

আমার কথায় বাধা দিয়ে আততায়ী ফোঁফাতে ফোঁফাতে মেয়েলি গলায় বললে, আই অ্যাম্ নট্ দি সন বাট্ দি ডটার অব এ লর্ড। বলেই ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগল।

আমি ত চমকে উঠলুম। এ ত হিগিনবিগিন নয়। আর হুঁশ ফিরতে এই প্রথম টের পেলুম এনিমির গাটা ত বেশ নরম নরম। তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে দিতেই সে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে।

বললে, আমার পা ভেঙ্গে গেছে বোধ হয়. আই কা'ন্ট স্ট্যাণ্ড।

বড্ড লজ্জা পেলুম। শেষ পর্যন্ত নারী হত্যার দায়ে পড়তে যাচ্ছিলাম যে। ছি ছি। বললুম, সরি ম্যাডাম, আমি বুঝতে পারিনি। তুমি কে? এ সময়ে এখানে কেন?

শুনতে পেলুম অপূর্ব কণ্ঠস্বর। ছোটে খাঁর সারেঙ্গিতে যেন মুন লাইট্ সোনাটার লহরা বাজছে।

বললে, সবাই আমাকে লেডি পমেটম বলে ডাকে। আমার বাবা হিগিনবিগিন। বাট আই অ্যাম ইওর ডালিং। তুমি তাই বল। সেদিন শিলিগুড়ি স্টেশনে তোমাকে দেখে ইস্তক আমার ফার্স্ট সাইটিস্ হয়ে গেছে। ইনকিওরেবল্। অল্ মাই ফ্রেণ্ডস্ আর ইওর ক্লায়েণ্টস্। তুমি খুব ভাল ফটো তোল তাই জানতুম। কিন্তু তুমি যে তার চেয়েও ভালো, তা শিলিগুড়িতে টের পেলুম। ইউ আর এ রিয়েল হিরো ব্রজদা, এ সেক্সপীরিয়ান হিরো। ব্রজদা, ব্রজ, মাই ডিয়ার ব্র, তুমি আমার ওথেলো।

বুঝে ছ্যাখ, কি সংকটময় অবস্থা। সেই অন্ধকারে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ও এই সব বলে যাচ্ছে আর ফাঁকে ফাঁকে আমার গালে মুখে—ঐ তোরা যা ইংরেজি সিনেমায় নিত্যি দেখিস আর, কি—সে সবও চলছে। কিন্তু আমি অচল অটল।

বললে, ওর বাপ নাকি অধৈর্য হয়ে আজ আমাকে গুম করার প্ল্যান করেছে। অতি কষ্টে চাবিটা হাতিয়ে আমার পালাবার সুযোগটা তাই করে দিতে এসেছে। একথা শুনে আমি যেই ধন্যবাদ দিতে গেছি এমন সময় লর্ড হিগিনবিগিন এক হাতে মোমবাতি



একহাতে মোমবাতি, আরেক হাতে তলোয়ার

আরেক হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে পারফেক্ট একটি ভিলেনের মত প্রবেশ করলেন। সেই আলোয় লেডি পমেটমের দিকে চেয়ে দেখি আরে এ যে সেই মুখ সেই চক্ষু দুটি। দেখা মাত্র আমার সমগ্র মুখ-ভাব, আমার চাউনি, বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় নায়কের

বক্স অফিস হিট্ করা হাবভাবের সঙ্গে টু দি পয়েন্ট মিলে গেল। কোথায় ভেসে গেল হিগিনবিগিনের হিংস্র উপস্থিতি, কোথায় বা ভেসে গেল তার খোলা তলোয়ারের শাণিত ভ্রুকুটি। একের চোখের উপর অন্যের আঁখি তারা স্থির হয়ে আছে। সব ভুলে আমরা শুধু পরস্পরের দিকে চেয়ে আছি। বাপ চেয়ে আছে মেয়ের দিকে মেয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে আর আমি চেয়ে আছি ওর বাপের দিকে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। এবারে সুরু হল সংলাপ।

বললুম, তুমি !

বললে, হ্যাঁ।

বললুম, তুমি, সত্যিই তুমি ! সেই তুমি !!

বললে, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সেই আমি।

হিগিনবিগিন ঃ এ সবের অর্থ ?

লেডি পমেটম ঃ ফাদার, দি প্রিজনার ইজ দি মাস্টার অব মাই লাইফ।

হিগিনবিগিন (সগর্জনে) তার মানে ?

আমি ঃ লর্ড সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় আছে কি ?

হিগিনবিগিন ঃ হু ইজ বঙ্কিমচন্দ্র ?

আমি ঃ জীবিতকালে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট : ইদানীং ঋষি হয়েছেন। ফার্স্ট গ্রাজুয়েট অব্ ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি। ফাদার অফ বেঙ্গলি নভেল। গ্র্যাণ্ড ফাদার অফ বেঙ্গলি রম্য রচনা। অ্যাণ্ড ক্রিয়েটার অব্ ইণ্ডিয়াজ্ অ্যাডিশন্যাল ন্যাশন্যাল সঙ্ বন্দেমাতরম্।

হিগিনবিগিন ঃ হ্যাঙ ইওর বঙ্কিমচন্দ্র।

আমি ঃ সেটা এখন একটু শক্ত সাহেব, তিনি অনেককাল গত হয়েছেন কিনা। বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল পড়া থাকলে তোমার মেয়ের

কথার মানেটা বুঝতে। এই ডায়ালগটা দুর্গেশনন্দিনীতে আছে। সাহেব, সোমত্থ মেয়ে তোমার ঘরে, আর তুমি আমার মত একটা মদ্দ জোয়ানকে বন্দী করে রেখেছ! নাও এখন ঠ্যালা সামলাও। তবে তোমার মেয়ের সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলুম তা আমি উইথ্‌ড্র করছি। সি ইজ দি কুইন অফ অল কুইনস। এর পোর্ট্রেট তোলার সুযোগ পাওয়া ত ফটোগ্রাফারের মহা ভাগ্যি।

হিগিনবিগিন একথা শুনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বার বার বললেন, হাউ নাইস অব্ ইউ। আমাকে বেঁধে রাখবার জন্য, না খেতে দেবার জন্য, গুম করার প্রস্তাবের জন্য আলাদা করে ক্ষমা চাইলেন।

হিগিনবিগিন বললেন, মিঃ কারফর্মা তোমার যা ক্ষতি করেছি আমি তা পূরণ করতে চাই। বল, কি তুমি চাও।

তোরা আজকালকার ছোকরারা এমন একটা সুযোগ পেলে ফস করে হয়ত একটা চাকরিই চেয়ে বসতিস। কিন্তু বুকের ছাতি টান টান করে আমি বললুম, স্বরাজ চাই। স্বরাজ চাই। স্বরাজ ইজ মাই বার্থ রাইট্। দেশের স্বাধীনতা ছাড়া আমার আর কোন কাম্য নেই।

হিগিনবিগিন : সিডিশাস্ কথা বলো না। আর তাছাড়া স্বরাজ দেব, সে ক্ষমতাও আমার নেই।

লেডি পমেটম : তবে বাবা, অনুমতি দাও, আমি ওকে বিয়ে করি। হি ইজ মাই লাভ।

হিগিনবিগিন সে কথা শুনে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ও লাকি ডগ, লাকি ডগ।

ব্রজদা আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে লাগলেন।

সুনীল বললে, তা আমাদের সেই বৌদির সঙ্গে পরে বুঝি ডাইভোর্স হয়েছে ব্রজদা।

ব্রজদা একটু হেসে বললেন, না, রয়েল ফ্যামিলিতে ডাইভোর্স হয় না। ও বিষয়ে ওদের নিয়ম বড় কড়া। আসলে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা আর হল না। ঠিক সেই সময় বঙ্গভঙ্গ হয়ে গেল কিনা। মুভমেন্টে নেমে পড়লুম। অ্যারেস্ট হলুম। আর জানিস ত পুলিশ রিপোর্ট থাকলে, বৃটিশ জাত সামান্য একটা বেয়ারার চাকরিই দেয় না, আর এ ত একেবারে জামাই করা। হ্যাঃ।

নয়

তা বিশ্বাস করবি কেন ? ওরা চীনে কি না।

ব্রজদা একেবারে খেঁকিয়ে উঠলেন।

বললেন, হিলারি এভারেস্টে উঠল, সেটা বিশ্বাস করতে ত তোদের বাধে নি। কেন না হিলারি যে সাহেব ! বৃটিশ !

না না নিউজিল্যাণ্ডার। সুনীত মুখ ফস্কে কথাটা বলে ফেলেই সঙ্গে সঙ্গে জিভ্ কাটল।

ব্রজদা বললেন, ঐ একই কথা, যার নাম চালভাজা, তারই নাম মুড়ি। ছ্যাখ নিতে ! আমাকে জিওগ্রাফি শেখাস নি। রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়ার গোড়াপত্তন হয়েছিল এই হাত দিয়ে। স্যর জর্জ এভারেস্ট রিটায়ার করলে রাধানাথদাকে সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট করবার প্রস্তাবও এই শর্মাই করেছিল। কিন্তু আমাদের জাতের শ্লেভ্ মেণ্টালিটি ত আর আজকের আমদানি নয়। খেতাবধারী গোটাকতক অকাল কুষ্মাণ্ড খয়ের খাঁ বিপক্ষে ভোট দিয়ে ব্যাপারটা ভণ্ডুল করে দিলে। নইলে দেখতিস্ বৃটিশের বিরুদ্ধে সেটাই হত ফার্স্ট ন্যাশন্যাল আপরাইজিং।

সুনীত ঘোষ টোকা মারা কেন্নোর মত গুটিয়ে ফেলল নিজেকে।

সুনীল বোস জিজ্ঞেস করল, ঘটনাটা কবেকার ?

ব্রজদা একটু ভেবে নিলেন। বললেন, তা এইট্টিন ফিফ্‌টি ওয়ান, না ফিফ্‌টি ওয়ান নয়, ভুল বলছি, ফিফ্‌টি টু-এর। ইয়েস, এইট্টিন ফিফ্‌টি টু। সালটা ভারতের ইতিহাসে সর্বদা স্মরণীয়। কারণ ঐ বছরই গুড্ ফ্রাইডের আগের দিন এক বাঙ্গালী অঙ্ক কষে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আবিষ্কার করেন। আর ২৫শে ডিসেম্বর, খৃস্টমাসের দিন আরেক বাঙ্গালী সেই শৃঙ্গ সর্বপ্রথম ডিঙিয়ে চলে যায়।

সবাই মিলে সমস্বরে বলে উঠলাম, কি করে ?

ব্রজদা বললেন, কেন, হাই জাম্প দিয়ে।

আমি অবাক। যদুদা হতভম্ব। সুনীত নিরুত্তর। সুনীল গলগল করে ঘামতে লাগল।

ভ্রূক্ষেপ না করে ব্রজদা বলে চললেন, আবিষ্কারক বাঙ্গালীর নাম যে রাধানাথ শিকদার, আশা করি তা আর বলে দিতে হবে না। দ্বিতীয় জনের নামই তোমরা জান না। এখন জেনে রাখ, তার নাম ব্রজরাজ কারফর্মা। চীনেরা এভারেস্টে উঠেছে এই খবরটাই তোমরা প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতে পারছ না, আমার হিস্ট্রি শুনলে ত তোমরা হিস্টিরিয়া হয়ে মরবে। বাঙ্গালী যদি নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে পারত, তাহলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম আজ আর মাউণ্ট এভারেস্ট হত না, হয় রাধাচূড়া হত, না হয় হত রাজশৃঙ্গ।

যদুদা জিজ্ঞাসা করলেন, রাধাচূড়া না হয় বুঝলাম। কিন্তু রাজশৃঙ্গ ? রাজ কেন ?

ব্রজদা বললেন, ওটা রাধানাথদারই প্রস্তাব। অমন নির্লোভ ব্যক্তি জীবনে আর ত দ্বিতীয়টি দেখলুম না। এভারেস্ট (তোদের সুবিধের জন্য এভারেস্টই বলছি) ডিঙিয়ে ফিরে এসে যেদিন

রাধানাথদার পায়ের ধুলো নিলুম, সেদিন প্রথম কথাই জিজ্ঞেস করলেন, একচুয়াল হাইট্‌টা কত দেখলি ?

বললুম, ২৯০০২ ফুট। আপনার গণনা অভ্রান্ত।

রাধানাথদা বললেন, ঠিক মেপেছিলি ত।



কেন, হাইজাম্প দিয়ে

বললুম, ভুল হবার কোন চান্স নেই। ২৮৯৯০ ফুট উপরে উঠেছি অমনি অলটিমিটারে তুষার কুচি ঢুকে সেটা বিগড়ে গেল। তখন সেখান থেকেই দিলুম ফুলফোর্সে এই হাই জাম্প। এভারেস্ট

ডিঙিয়ে পড়লুম এসে থায়াংবচি গুম্ফার উঠোনে। সেদিন সাংঘাতিক পরিমাণে তুষারপাত হয়েছিল তাই রক্ষে। পেঁজা তুলোর মত নরম তুষারের উপর পড়ে ছিলুম। হাড়গোড় ভাঙ্গেনি। আপনি ত জানেন দাদা, আমি ম্যাক্সিমাম ১২ ফুটই ক্লিয়ার করতে পারি। তাহলে ২৮৯৯০ + ১২, ইকুয়্যালটু ২৯০০২ ফুটই দাঁড়াল। এ বাবা ক্যালকুলেশনের ব্যাপার, পিওর এরিথমেটিক, একটুও এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

রাধানাথদা দুহাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছেলে মানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। আনন্দে।

বললেন, ব্রজ রে, তুই বাঙ্গালীর মুখ রাখলি। কিন্তু খবরদার একথা এখন প্রকাশ করিস নি। সাহেবরা তোকে কিন্তু গুম করে ফেলবে। তোর নামে আমি এই শৃঙ্গের নাম করলুম। ব্রজচূড়া, নাঃ কানে ভাল ঠেকছে না। ব্রজবাজ শৃঙ্গ, উহুঁ। হঠাৎ ইউরেকা বলে লাফিয়ে উঠলেন রাধাদা। বললেন, পেয়েছি। রাজশৃঙ্গ। ব্রজ-বাজের রাজটুকুই নিলুম, সুন্দর হয়েছে নামটা। রাজশৃঙ্গ। আবার শৃঙ্গের রাজা,সে মানেও করা যাবে। এই নামই থাকল। এখন চেপে যা। এই ভবিষ্যৎ বাণী করলাম, দেখিস, দেশ স্বাধীন হলে কর্পো-রেশনের কাউন্সিলাররা বিলিতির বদলে দিশি নামের সাইনবোর্ড-খানা এভারেস্টের গায়ে ঝোলাবার প্রস্তাব পাশ করে দেবে।

ব্রজদা বললেন, আরে আগের আমলের লোকেরা ছিল ত্রিকালদর্শী। কলকাতা কর্পোরেশন তৈরী না হতেই, তার কাউন্সিলারের সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী যা করেছিলেন, এখন হাতে হাতে তা মিলিয়ে দেখে নে। রাজশৃঙ্গ নামটা বঙ্কিমবাবুরও খুব মনঃপুত হয়েছিল, বুঝলি। এর অনুকরণে বঙ্কিমবাবু তাঁর এক উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন রাজসিংহ। রাধানাথদা ব্যাপারটা ওকে বলেছিলেন কি না। তাহলে হিস্ট্রিটা বলি তোদের।

সুনীল বোস শিউরে উঠে বলল, দোহাই ব্রজদা, আপনার এই অসুস্থ শরীরে আপনাকে এখন আমরা কিছুতেই এভারেস্টে উঠতে দেব না। এই ত কদিন হল করোনারির ধকল থেকে উঠলেন। এবার কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন।

ব্রজদা সস্নেহে সুনীলকে এক ধমক মেরে বললেন, থাম। করোনারিই বল আর পরনারীই বল ব্রজরাজ কারফর্মাকে ঘায়েল করতে পারে যে নারী সে ত আর সমতল ভূমিতে থাকে না। থাকে হিমালয়ের কাঁধে, স্নো লাইনের অনে-ক উপরে। ২৭০০০ ।ফটের এক ইঞ্চি নিচে নামে না। সেই নারীই বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে আমাকে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার খিড়কির দরজা দেখিয়ে দিয়েছিল। সে হচ্ছে এক তুষারনারী। ইংরেজদের ঐ কুচ্ছিৎ ভাষায় যাকে বলে আবমিনেবল স্নো উওম্যান। আমি যেবার এভারেস্ট এক্সপিডিসনে যাই, ভাগ্যক্রমে দেখা পেয়েছিলুম ঐ রকম এক তুষারনারীর। সে ভাই নারী অফ অল নারীজ্। সেই ছিল আমার গাইড্। তাহলে শোন।

ব্রজদা নড়ে চড়ে সিধে হয়ে বসলেন।

বললেন, একদিন সন্ধ্যের সময় রাধানাথদার বাড়িতে গেছি। দেখি কি, গম্ভীরভাবে দাদা বারান্দায় পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেও যেন দেখলেন না। টেবিলের উপর কাগজপত্র ছড়ান। জ্যামিতি, ত্রিমিতির বিস্তর নক্সা এঁকেছেন, বিস্তর অঙ্ক কষেছেন। একটু পরেই এসে চেয়ারে বসলেন। আবার ডুবে গেলেন গণিতের দুরূহ ক্যালকুলেশনের অতল গভীরে। কি কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে তখনও বুঝিনি। অনেকক্ষণ পরে হতাশ হয়ে বলে উঠলেন, না হচ্ছে না। কোথায় যেন গোলমাল হচ্ছে।

এমন সময় আমার দিকে নজর পড়ল। একটু হেসে বললেন,

কি রে, কখন এলি ? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই আবার ডুবে গেলেন ধ্যানে। বসে থাকলে পাছে তাঁর কাজে ব্যাঘাত হয়, আমি তাই চলে এলাম। আসবার সময় একটা কাগজে লিখে রেখে এলাম "গোড়ায় গলদ"।

পরদিন বিকালে রাধানাথদা পাগলের মত ছুটতে ছুটতে আমার বাসায় এলেন। চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন, ব্রজ আছিস ? ব্রজ ? ডাক শুনে বেরিয়ে আসতেই আমাকে এক হ্যাঁচকা টানে কাঁধে তুলে রাধানাথদা ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন। যত বলি, ছাড়ুন ছাড়ুন, দাদা, করছেন কি ? তা সে কথা কে শোনে। খানিকক্ষণ নাচানাচি করে দাদা আমাকে নামিয়ে দিলেন। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, ব্রজ, আজ আমি পৃথিবীর সব থেকে উঁচু চূড়া আবিষ্কার করেছি। কদিন ধরেই এর পিছনে লেগে ছিলুম। হিসেব আর কিছুতেই মিলছিল না। হঠাৎ তোর চিরকুট্‌টার উপর নজর পড়ল। দেখলুম গলদটা সত্যিই গোড়াতে। ভুলটা ছিল লম্ব অভিক্ষেপে। আজ আপিসে বসে নতুন করে হিসেব শুরু করতেই বেরিয়ে পড়ল উচ্চতম শৃঙ্গ। আর এটা সম্ভব হয়েছে তোরই জন্য। ভুলটা ভাগ্যিস ধরিয়ে দিয়েছিলি।

রাধানাথদার কথা শুনে আমি ত ভাই লজ্জায় মরে যাই। কী-ই বা এমন করেছি। নেহাৎ ভুলটা চোখে পড়ে গিয়েছিল তা-ই। কিন্তু সে কথা দাদাকে বোঝাতেই পারলাম না।

কদিন পরে রাধানাথদা বললেন, দ্যাখ ব্রজ, একটা কাজের ভার তোকে দিতে চাই। পারলে তুই-ই পারবি। নিবি কাজটা ?

জিজ্ঞাসা করলাম, কাজটা কি ?

রাধানাথদা একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর চুপি চুপি বললেন, তোকে ঐ শৃঙ্গটায় চড়তে হবে। পারবি ? আমি চাই

এই শৃঙ্গে সর্বাগ্রে বাঙালীর পদচিহ্ন পড়ুক। রাধানাথদার কথা শুনে আমি ত এক পায়ে খাড়া। বললুম, আপনি গুরুজন, আপনার আদেশ শিরোধার্য।

রাধানাথদার আশীর্বাদ নিয়ে তারপর দিনই রওনা দিলুম। এখনকার মত এত লোক লস্কর লটবহরের বালাই ছিল না আমার। তিব্বতী লামার ছদ্মবেশ ধরে রওনা দিলুম অজানা সেই শৃঙ্গটির দিকে। ঘণ্টায় দশ মাইল এবং দিনে-রাত্রে বিশ ঘণ্টা হেঁটেছি তখন; দার্জিলিং, নেপাল, ভুটান, সিকিম, পার্বত্য ত্রিপুরা পেরিয়ে যাতুং-এর উপর দিয়ে ঢুকে পড়লাম তিব্বতে।

যাতুং-এর চটিতে এক লামার সঙ্গে আমার দেখা হল। সে লাসায় যাচ্ছে। তার কাছ থেকেই খবর পেলাম চো মো লাংমা বলে এক সুউচ্চ শৃঙ্গ আছে তাদের দেশে যার মাথা ডিঙিয়ে সূর্যও যেতে পারে না। দেখলুন তার বর্ণনার সঙ্গে রাধানাথদার কথার কিছু কিছু মিল হচ্ছে। ঠিক করলুম চো মো লাঙ্‌মাটাই দেখে আসব। লামাটাই বললে, ঐ পাহাড়ের নিচেতেই একটা বড় মঠ আছে। মঠটার নাম রংবক।

এই সামান্য মাত্র সংবাদ আর কম্পাসের উপর নির্ভর করে রওনা হলাম রংবকের দিকে। সঙ্গে ছিল দুটি মাত্র চমরি গাই। একটা মাল বইত আরেকটা দুধ দিত। মে মাসে কলকাতা ছেড়েছিলাম। পুরো বর্ষা তিব্বতের পথে পথে কাটিয়ে দিলাম। রংবকে যখন পৌঁছালাম তখন অক্টোবরের শীত হানা দিতে শুরু করেছে। পুরো নভেম্বর মাসটা সেই মঠে বিশ্রাম নিলাম। খাই দাই ঘুরি। অ্যাক্লাইমেটাইজেশনও হয়। অর্থাৎ ওখানকার আবহাওয়াটা সইয়ে নিচ্ছিলুম। লুকিয়ে লুকিয়ে ম্যাপও আঁকি। আর সন্ধ্যেবেলার প্রার্থনা শেষে মঠের বুড়ো বুড়ো লামাদের সঙ্গে হীনযান, মহাযান, ব্যোমযান, অম্লযান,

যবক্ষারযান সাধনতন্ত্রের গূঢ় অর্থ নিয়ে আলোচনা করি। কোন বিষয়েই আমাকে কাবু কেউ করতে পারে নি।

আমি কাবু হয়েছিলাম ওখানকার শীতে। সে শীত বর্ণনা করা যায় না। মাঝে মাঝে মনে হত আমার মাংসগুলো কুরুনি দিয়ে কেউ বুঝি কুরে নিচ্ছে। হাজার হাজার হাঙ্গরের দাঁত আমার হাড়ের উপর বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাপমাত্রা একবার এমন নামাই নামল যে, একদিন দেখি আমার ব্যারোমিটারটার পারদ তলা ফুটো করে মাইনাস জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত নেমে গেছে। গিয়ে পেণ্ডুলামের মত ঝুলছে। বুঝে তাখ কারবারখানা !

ব্যারোমিটার না থার্মোমিটার ? সুনীত সরলভাবে জানতে চাইল।

ব্রজদা তার দিকে না চেয়েই জবাব দিলেন. আসলে ওটা ছিল থার্মাল-ব্যারো-অল্টি-কম্পাস। ঐ এক যন্ত্রেই সর্বকার্য সিদ্ধি। ঐ যে তোদের সবার্থসাধক না কি, তাই। হাঁ, এখন শীতের কথা শোন।

তোদের বলব কি, অনেক খেটে-খুটে আমি একখানা রিলিফ ম্যাপের খসড়া করছিলাম। রাত্তির বেলা শোবার আগে আমি চো মো লাংমার অর্থাৎ এভারেষ্টের একটা পেন্সিল স্কেচ করে রেখেছিলাম। সকালে উঠে দেখি সেই রাফ্ স্কেচের ডগাতেই শক্ত শক্ত বরফ জমে গেছে। অ্যাইসাই শীত সেখানে। আমার দুধেল চমরি গাইটা শীতের চোটে ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়তে লাগল। একদিন ত যায় যায় অবস্থা। ওর শরীরের তাপ বাড়াবার জন্য চিনির কনসেনট্রেটেড ট্যাবলেট্ গোটাকয়েক খাইয়ে দিতেই চাঙ্গা হয়ে উঠল ! পরদিন দুধ দুইতে গেছি। দুধ আর বেরোয় না। জোরে জোরে টান দিতেই দেখি বাঁট দিয়ে চুঁইয়ে

চুঁইয়ে বড়বাজারের স্পেশ্যাল কুলপি মালাই বেরোচ্ছে। এক একটা করে তাই সবাইকে খেতে দিলাম। লামারা সাত জন্মে কুলপি খায়নি। এমন বড়িয়া চীজ খেয়ে ওরা আমার উপর যে কি খুশি হল, তোদের কি বলব। সবাই মিলে আমাকে আশীর্বাদ করলে। কিন্তু ফাঁকা আশীর্বাদে কি শীত মানে? আমার ত অক্কা পাবার অবস্থা হল।

আমার অবস্থা দেখে মঠের সব চাইতে যে বৃদ্ধ লামা, তার বড় করুণা হল। একদিন রাতে এসে আমায় বললে, বাচ্চা, এমনভাবে থাকলে তুই মরে যাবি। তোকে একটা মাদুলি দিচ্ছি, তুই লুকিয়ে সেটা হাতে বেঁধে রাখ। শরীর গরম হয়ে যাবে। কিন্তু খবরদার একথা কেউ যেন টের না পায়। তাহলে এরা তোকে মেরেই ফেলে দেবে। মঠধারী ছাড়া এসব জিনিস কাউকে দেওয়া নিষেধ।

মাদুলিটা বাঁ হাতের ডানায় বেঁধে নিলাম। কি আশ্চর্য, সেই মাদুলির ক্ষমতা! দেখতে দেখতে শরীর গরম হয়ে গেল। একটু পরে গলগল করে ঘাম বেরুতে লাগল। একে একে গরম জামা খুলে ফেললাম। শেষ পর্যন্ত সেই মাইনাস জিরো ডিগ্রি টেম্পারেচারে, বললে বিশ্বাস করবি নে, শুধু আণ্ডারওয়ার আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে চমরি গাইয়ের ল্যাজ নেড়ে নেড়ে হাওয়া খেতে লাগলাম।

মাদুলিটা অনেকদিন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল। কতবার শীতকালে যে পরিবারশুদ্ধু ঐ মাদুলি নিয়ে দার্জিলিং-এ চেঞ্জে গেছি তার আর হিসেব নেই। একটা এয়ার-টাইট কাঠের হাত-বাক্সে মাদুলিটা পুরে রাখতাম। কারণ এ দেশের যে শীত তাতে মাদুলিটা আর দেহে ধারণ করতে হত না। ঐ কাঠের বাক্সটা ঘরের এক কোণে রেখে দিলেই গোটা বাড়িটা দিব্যিগরম হয়ে

যেত। খুব বেশি শীত পড়ল ত, ডালাটা সামান্য একটু ফাঁক করে দাও। ঐ যথেষ্ট।

সুনীত খুব শীত-কাতুরে। বললে, মাদুলিটা আছে ব্রজদা?

ব্রজদা ম্লান হাসি হেসে বললেন, তবে আর দুঃখের কথা বলছি কেন? আমার মুখে এই মাদুলির কথা শুনে স্যর পি সি রায় একদিন আচার্য রমণকে কথাটা বলেন। তারপর দুজনেই একদিন আমার বাড়িতে এসে হাজির। মাদুলিটা দেখতে চাইলেন। তখন গরমকাল। বরফের গামলায় বাক্সটা ডুবিয়ে রাখতে হত।

কি আর করি, সেই গামলা সুদ্ধ বাক্সই এনে দেখালাম। আচার্য রমণ আসল বৈজ্ঞানিক ত। অ্যাস্‌বেস্টাসের দস্তানা পরে বাক্স খুলে মাদুলিটা হাতে নিলেন। ঘরের ভিতর গরমে অস্থির হয়ে উঠলুম। বললাম, ছাতে হাওয়া আছে, চলুন যাই। তিনজনে ছাতে গেলাম। দেখি কি ঈশান কোণে মেঘ করেছে।

আচার্য রমণও মাদুলির ক্রিয়া দেখে অবাক হয়ে গেছেন। এইটুকু বস্তুর মধ্যে এত প্রচণ্ড এনার্জি লুকিয়ে আছে। ভিতরে কি আছে দেখবার কৌতূহল দমন করতে না পেরে তিনি একটা ছুরির ফলা দিয়ে মাদুলির মুখটায় চাড় দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুরির ফলাটা গলে জল হয়ে হয়ে টুপ টুপ করে ঝরে পড়ল। মাদুলির তেজটা একবার বোঝ। শেফিল্ডের ইস্পাতও মাখনের মত গলে গেল। এখন সমস্যা দাঁড়াল, মাদুলির মুখটা খোলা যায় কি করে? আমি একটু হেসে তোদের বউদিকে ডাকলাম। সে বাঙ্গালীর মেয়ে। দিনরাত হেঁসেলেই পড়ে থাকে। গনগনে হাঁড়ি কড়াই খালি হাতে অনবরত নামাচ্ছে উনুন থেকে। তার হাত দুখানা ত ফায়ার প্রুফ! বললাম, মাদুলির মুখটা খুলে দাও ত। কিন্তু তোদের বউদিও ফেল মেরে গেল। তখন সত্যিই আমি অবাক হলাম। তাহলে উপায়?

• আশ্চর্য, উপায় তোদের বউদিই বাতলে দিলে। এরকম উপস্থিত বুদ্ধি খুব কম লোকেরই আছে। বললে, দাঁড়াও এখুনি খুলে দিচ্ছি। একটা দেশলাই-এর কাঠি নিয়ে আসছি। বললাম, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। নাকি মস্করা করছ? দেখছ বিলিতি মেকারের ইস্পাতের ছুরি গলে গেল, আর তুমি দেশলাই-এর কাঠি আনতে যাচ্ছ! তোদের বউদি বললে, বিলিতি মেকারের ছুরি বলেই গলেছে, এ হচ্ছে স্বদেশী মেকারের দেশলাই, সূর্যের গায়ে ঘষলেও এর কাঠি জ্বলে না।

সত্যিই তাই, কোত্থেকে এক "ক্ষুদিরামের ফাঁসি" মার্কা দেশলাই নিয়ে এল। ছবির নিচে "বাই স্বদেশী" লেখা আছে। একটা কাঠি বের করে তোদের বৌদি তা দিয়ে খুঁটে খুঁটে অনায়াসে মাদুলির মুখটা খুলে দিলে। দুই আচার্য স্বদেশী দেশলাইয়ের মহিমা দেখে ধন্য ধন্য করে উঠলেন। আচার্য রমণ মাদুলিটাকে তার অ্যাসবেস্টাসের দস্তানার উপর উপুড় করে ঢেলে দিলেন। খুব সূক্ষ্ম একটা কি পড়ল, তাও দেখলাম। আচার্য রমণ হাতটাকে চোখের কাছে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কাল বোশেখীর দমকা ঝড়ে বস্তুটি স্যাঁৎ করে উড়ে চলে গেল। আচার্য রমণ হায় হায় করে উঠলেন। ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। ও কি আর পাওয়া যায়?

ব্রজদা গভীর বিষাদে নিমজ্জমান হয়ে গেলেন।

সুনীত রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। ব্রজদা থামতেই প্রশ্ন করল, সেই সূক্ষ্ম বস্তুটা কি? আপনি দেখেছিলেন ব্রজদা?

দেখেছি বৈ কি।

বললাম, কি সেটা?

ব্রজদা বললেন, একগাছি রোঁয়া।

রোঁয়া!

কিসের ধোঁয়া ?

ব্রজদা বিরক্ত হলেন। বললেন, তা আমি কি জানি ?

ব্রজদা গুম মেরে বসে রইলেন। তারপর দুম করে বলে উঠলেন, আর ও কি যে সে মাদুলি। একবার প্রকাণ্ড এক তুষার ধসের নিচে কবরস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। তিন দিন তিন রাত সেই বরফের পাহাড়ের নিচে চাপা পড়েছিলাম। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে কেউ বাঁচে না। কারণ প্রথমত, তুষার ধস বা অ্যাভালান্সের ধাক্কা। সে ধাক্কায় ছোটখাট পাহাড় গুঁড়িয়ে যায় ত মানুষ কোন ছার। দ্বিতীয়ত, অ্যাভালান্স বা তুষার ধসের ওজন। যদিও দৈবগতিকে ধর অ্যাভালান্সের ধাক্কাটাও সামলালি, কিন্তু পাহাড়প্রমাণ বরফের স্তূপের হাজার হাজার টন ওজনের চাপেই যে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবি। এবং তৃতীয়ত, অক্সিজেনের অভাব। তোর শরীরের উপর—'সে রাফলি'---বিশ হাজার টন বরফ পড়ে আছে। তুই নিঃশ্বেস নিবি কি করে ? যদিও ধর কোন গতিকে ধুকপুক করে কিছুক্ষণ শ্বাসগ্রহণ প্রক্রিয়াটাকে চালু রাখলি কিন্তু অক্সিজেন, অক্সিজেন পাবি কোথায় ? এই সব কারণেই ভাল ভাল মাউন্টেনিয়াররা অ্যাভালান্স ট্যাভালান্সকে পারতপক্ষে এড়িয়েই চলতে চায়। কারণ তারা জানে, এর কবলে পড়া মানেই অবধারিত মৃত্যু। তবে আমি মরিনি। যদি বলিস কেন ? তবে তার উত্তর ঃ ঐ মাদুলি। সে এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী। বলছি শোন।

ব্রজদা সিগারেট ধরাবার জন্য একটু থামলেন।

এই ফাঁকে সুনীত বলল, এভারেস্টে ওঠা তবে কি আজ বন্ধ থাকল ?

ব্রজদা ইঙ্গিতটা বুঝে কটমট করে তার দিকে চাইলেন।

বললেন, তোদের ব্রজদা একবার যে কাজে হাত দেয় তা শেষ না করে থামে না। এভারেস্টের দিকেই যাচ্ছি।

একটু থেমে ব্রজদা ফস ফস করে সিগারেটে কয়েকটা টান দিলেন।

তারপর বললেন, সেই বুড়ো লামা, কৃপা করে যিনি আমাকে মাতুলিটা দিয়েছিলেন, তাঁর নাম সংক্ষেপে হচ্ছে ঘ্যাঙচক থোগ্গাপ ৎসেরিখেরি লবসাঙ কাঙপোঙ দোরপু জবড়জঙ্গ দোরজে। আসলে তিনি থ্রিজঙ্গ মঠের লামা। আর আমি ঐ অঞ্চলে যে ছদ্মনামে ঘুরেছি সেটা হচ্ছে বোরজে ৎসাম্পো রাজজঙ্গ নোরগে ৎছোগ লাগ খাঙ কারফঙ গাম্পো। আমার মঠের নাম বলেছিলাম ভুজুংভাজঙ মঠ। পরস্পরের সুবিধের জন্য আমি তাঁকে বলতাম ঘ্যাঙচক লামা আর তিনি আমাকে বলতেন বোরজে লামা। ঘ্যাঙচক লামা আমাকে রোজ একবার করে সাবধান করে দিতেন, খবরদার, এই মঠের লামা ব্যাটারা যেন ঘুণাক্ষরেও তোমার মাতুলির কথা টের না পায়। তাহলে বরফের নিচে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। সর্বদা জামা কাপড় গায়ে দিয়ে থাকবে।

আমি ঘ্যাঙচক লামার উপদেশ সর্বদা মেনে চলতে চেষ্টা করতুম। কিন্তু সেই মাতুলি হাতে বেঁধে জামা গায়ে দিয়ে থাকে কার সাধ্যি। তবু ত আমি ঢিলে হাতা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে চাপিয়ে রাখতুম। কিন্তু মাতুলির ডিরেক্ট কনট্যাক্টে ছিলাম ত, তাই ঐ মাইনাস জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেও আদ্দির পাঞ্জাবী অসহ্য লাগত। মনে হত, জুন মাসের গনগনে কলকাতায় যেন ফুলহাতা সোয়েটার পরে আছি।

সুনীত ফট করে বলে বসল, আপনি ঐ বংবক মঠে আদ্দির পাঞ্জাবী কোথায় পেলেন?

সুনীল বলল, এসব কথা জিজ্ঞেস করবার মানে হয়? মঠের টেলারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্রজদা বানিয়ে নিয়েছেন।

ব্রজদা বললেন, তিব্বতী মঠ কি তোমাদের কমলাপতি স্টোরস্,

যে তার টেলারিং বিভাগ থাকবে। পাঞ্জাবীটা গুলু ওস্তাগর লেনের ইয়াসিন দর্জির তৈরি। লখনউ-এর কলিদার ছাঁট। দুদিকের ডানার উপর আর বোতামের ঘরের দুপাশে নবাবি লেস দেওয়া। ও কাজ তিব্বতী দর্জির চোদ্দপুরুষও করতে পারত না। তোরা ত এক একটা আস্ত ছাগল। মাথায় ঘি নেই একটি ফোঁটা। তাই এমন আজগুবি কথা মনে আসে। কলকাতা থেকে যখন যাত্রা করি, তখন সময়টা কি ছিল মনে আছে ?

ব্রজদা সকলের মুখের দিকে একবার করে চাইলেন।

যদুদা বললেন, বোধ হয় গ্রীষ্মকাল।

ব্রজদা খিঁচিয়ে উঠলেন, আবার বেনিফিট অব্ ডাউট্ কেন ? স্পষ্ট করেই কাশ না। হ্যাঁ, পুরো গ্রীষ্ম। কলকাতার মে মাস। সেই গরমে আমি কি এখান থেকে অলেস্টার গায়ে দিয়ে রওনা হয়েছিলাম ! যতো সব। বৃথা সময় নষ্ট না করে, যা বলছি শুনে যা।

ব্রজদা শুরু করলেন : গরমটা তবুও মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছিলাম। দিনরাত ভয়ে ভয়ে আদ্দির পাঞ্জাবীটা পরে থাকতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাহিল করে ফেলল ঘামাচি। উঃ, ঘামাচির চিটপিটোনির জ্বালায় এক এক সময় মনে হত পাগল হয়ে যাব। মনে হত, টান মেরে দিই মাদুলিটাকে ফেলে। পরক্ষণেই ভয় হত, মাদুলি ফেললেই সর্দিগর্মি লেগে যাবে। হুপিংকাশি কি ডবল নিউমোনিয়া হওয়াও বিচিত্র নয়।

একদিন সন্ধ্যে রাত্রে আর থাকতে পারলাম না। এক টানে জামা গেঞ্জি খুলে ফেলে পট পট করে ঘামাচি মারতে শুরু করলাম আর ঠিক সেই সময় এক চোখ কানা দ্রিপুং লামা ব্যাটা সেই অবস্থায় আমায় দেখে ফেললে। সর্বনাশ ! তাড়াতাড়ি

পাঞ্জাবীটা পরে ফেললাম। কিন্তু সর্বনাশ যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। এক লাফে সে আমাকে জাপটে ধরল। তার একটা চোখ ধ্বক ধ্বক করে জ্বলতে লাগল।

বললে, কে তুই ? তুই ত লামা নোস। বিদেশী। গুপ্তচর। এখানে কি করতে এসেছিস ? বল, তুই কে ?

বলতে বলতে ফস্ করে একখানা ধারাল ছোরা বের করল। মুহূর্তের মধ্যে তাকে মারলাম এক রদ্দা। ঘুরে পড়ে গেল। আমি দেখলাম, এখন পলায়নই প্রশস্ত। যন্ত্র-পাতিগুলো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে আদ্দির পাঞ্জাবীটা পরে নিলাম। হাতের কাছে পেলাম তিব্বতী চায়ের দুখানা ইট। ভরে ফেললাম পকেটে।

তারপর বেরিয়ে পড়লাম। তখন তুষার ঝড় শুরু হয়েছে প্রচণ্ড বেগে। ঘণ্টায় সত্তর আশি মাইল ত হবেই। একশ হওয়াও বিচিত্র নয়। তার গতি সোজা দক্ষিণে। মঠের গেট বন্ধ। দুটো যমদূত গেট পাহারা দিচ্ছে। বিপদের উপর বিপদ। সেই দ্রিপুং লামা ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে প্রাণপণে তিব্বতী শিঙ্গা বাজাতে শুরু করেছে। মুহূর্তের মধ্যে মঠের ভিতর বিপজ্জনক সংকেত বেজে উঠল। হিংস্রতায় উন্মত্ত হয়ে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লামারা পিলপিল করে চারদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল। দেখলাম, বেড়াজালে পড়ে গেছি। অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে মঠের পিছনে মাঠের দিকে এগুচ্ছি। হঠাৎ কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। ঠাহর করে দেখি দুটো বেশ পেমাণ সাইজের রাম-শিঙ্গা মঠের উঠোনের বরফের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। রামশিঙ্গা দুটো পেয়ে বুঝলাম, এ ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আমার মুক্তির পথ পেয়ে গেছি। ঈশ্বরকে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে রামশিঙ্গা দুটো দু'পায়ে জুতোর নিচে বেশ শক্ত করে বেঁধে নিলাম। আর আমাকে পায় কে ?

ব্রজদা চুপ। আরেকটা সিগারেট ধরালেন। আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। অর্ধেকটা সিগারেট নিঃশব্দে ধোঁয়া করে উড়িয়ে দিয়ে ব্রজদা নড়েচড়ে বসলেন।

বললেন, ভাগ্যিস্ একদিন শী-খেলাটা শিখে রেখেছিলাম! আজ সেটা এমনভাবে কাজে লাগবে বুঝতে পারি নি। শীএর তক্তার চাইতে তিব্বতী রামশিঙ্গের গুণ দেখলাম আরও বেশী। এখান সেখান থেকে দুটো বেশ পোক্ত দেখে লম্বা লম্বা লাঠিও জোগাড় করে ফেললাম। তারপর মঠের খিড়কির উঠোনে বার কয়েক পাক মেরে ট্রায়ালও দিয়ে নিলাম। বরফ পড়ে উঠোনটায় চমৎকার এক স্কেটিং রিং হয়ে গেছে। মনের আনন্দে শী করে বেড়াচ্ছি, এমন সময় গোটাকয়েক লামা আমাকে দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে ছুটে এল। আমি প্রবল বেগে শী-এ চড়ে গোটা উঠোনে বারচারেক পাক মেরে যতটা স্পীড্ আমার দরকার তা তুলে নিলাম। তারপর তড়াক করে দিলাম আকাশচুম্বি এক লাফ। এক লাফে মঠ ডিঙ্গিয়ে এসে পড়লাম রাবক হিমবাহে। ঝড়ের বেগ হু হু করে বেড়ে চলেছে। আমার পাঞ্জাবী ফুলে ফুলে উঠছে। বিদ্যুতের ঝিলিকের মত আরেকটা আইডিয়া আমার মাথায় খেলে গেল।

আমি লাঠি দুটো ফেলে দিয়ে পাঞ্জাবীর দুটি প্রান্ত চেপে ধরলাম। সেটা খানিকটা পালের কাজ করল। তখন ঝড়ো বাতাসের সেই তীব্র গতি ভয়াবহ বেগে আমাকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল দক্ষিণ দিকে। ডানদিকে একটু দূরে গিয়াংচু কাছের চূড়া এক ঝিলিক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

বাঁয়ে পড়ে থাকল খার্তা ফু। চাঙৎসের মাথা টপকে সোজা পড়লাম গিয়ে নর্থ কলে। রাতের অন্ধকারেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের। আর মাত্র

কয়েক হাজার ফুট। অলটিমিটারে দেখি, হু হু করে উচ্চতা বাড়ছে। পঁচিশ হাজার ফুট, ছাব্বিশ হাজার ফুট। আর



ভয়াবহ বেগে ঠেলতে লাগল আমাকে

মাত্র হাজার তিনেক ফুট। তাহলেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে এই সর্বপ্রথম মানুষের পদচিহ্ন পড়বে। আর সে মানুষ আবার এক বাঙ্গালী। মনে মনে প্রার্থনা করছি, হে ঈশ্বর,

বাতাস যেন এখন কিছুক্ষণ বন্ধ না হয়। সাপ্লাইটা আরও কিছুক্ষণ চালু রাখ প্রভো।

কিন্তু মানুষ যা চায়, সব সময় কি তা পায়। যে ঝড়ের সাহায্যে তরতর করে এতদূর উঠে এলাম অবলীলাক্রমে, সেই ঝড়ই আমাকে মারলে মোক্ষম এক ল্যাং। ঝড়ের গুঁতোয় সাতাশ হাজার পাঁচশ একচল্লিশ ফুট ওপরের এক জায়গায় বরফের লেয়ার উড়ে গিয়ে পাথর বেরিয়ে পড়েছে। আমার তিব্বতী শিঙ্গার শী সেই ন্যাড়া পাথরে ঠোক্কর খাওয়ামাত্র দুমড়ে মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে গেল। আমি হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়লাম। দুটো পা-ই মচকে গেল। কোনক্রমে দুহাতে ভর দিয়ে উঠতে গেলাম, এমন সময় অতর্কিতে ঘাড়ের উপর হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল এক অ্যাভালান্স। মুখ থুবড়ে সেই যে পড়লাম তিনদিনের মধ্যে আর উঠতে পারিনি।

কখনো উঠব তাই কি ভেবেছিলাম? থ্যাঙ্কস টু দ্যাট মাদুলি। তার কৃপাতেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। সেই মাদুলির আচে খানিকটা জায়গায় বরফ গলে জল হয়ে গিয়েছিল। সেই যে একটু ফাঁক হল তাতেই প্রয়োজনীয় অক্সিজেন থাকবার জায়গা মিলে গেল। আমার জ্ঞান হতেই দেখি পেল্লায় বরফের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছি।

ঘোর অন্ধকার। প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে। পকেট হাতড়ে হাতড়ে তিব্বতী চায়ের একখানা ইট থেকে এট্টুসখানি ভেঙ্গে নিলাম। তারপর এক খাবলা বরফ গুঁড়ো করে তার সঙ্গে মিশিয়ে ডান হাতের গণ্ডুষে সেই মিক্শ্চার নিয়ে বাঁ হাতের মাদুলিতে হাফ এ মিনিট ঠেকিয়ে রাখলাম। ধীরে ধীরে বরফ গলে জল হল। সেই জল ফুটে উঠতেই হাতটা সরিয়ে নিলাম। ব্যস্ বিউটিফুল লিকার। এমনি করে কয়েক গণ্ডুষ গরম চা পান

করতেই শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। তারপর সেই বরফের স্তূপে মাতুলি ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে বরফ গলাতে লাগলাম। তিনদিনের মধ্যে কয়েক হাজার টন বরফ ক্লিয়ার হয়ে গেল। প্রচণ্ড বন্যা হয়েছিল সেবার। মানস সরোবর ওভার ফ্লো করে গঙ্গা যমুনা প্লাবিত করলে। আবার ওদিকে ব্রহ্মপুত্রের চ্যানেলে যে জল বেরিয়ে গেল তা আসামকে তছনছ করে দিলে।

তিনদিন পরে আমি আবার আকাশ দেখলাম। তারপর ক্লান্ত হয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, জানিনে। চোখ মেলতেই দেখি, সূর্য ঢলে পড়ছে। বরফে বরফে সূর্যের রাঙ্গা আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে স্বর্গীয় অপার্থিব সব বর্ণালী খেলা সুরু হয়েছে। মুগ্ধ হয়ে নয়ন ভরে তাই দেখছিলাম। হঠাৎ শিওরের দিক থেকে এক বিজাতীয়, বড় মিঠে, বড় মধুর সঙ্গীত ভেসে এল। চমকে চেয়ে দেখি, একটু দূরে, একটা বড় বরফের চাঙড়ের উপর পা ঝুলিয়ে এক ভালুক বসে আছে। প্রথমটা চমকে উঠেছিলাম। তারপরই অবাক হলাম। এত উঁচুতে ভালুক এল কোত্থেকে? ভালুক আবার গান গায়, এত কখনো শুনিনি। ভালুকের দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছি। আবার সেই সঙ্গীত ধ্বনিত হল। এবার ঠাহর করে বুঝলাম, এ ত গান নয়, কথা। এক রকমের গীতিময় ভাষা। কান খাড়া করে মানে বুঝতে চেস্টা করলাম। আবার সেই সঙ্গীত শুনলাম। আর আশ্চর্য, অর্থটাও এতক্ষণে বোধগম্য হল। মাথা নেড়ে জবাব দিলাম, হ্যাঁ। তারপর—

সুনীত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ভালুকটা কি জিজ্ঞাসা করল?

সুনীল বিরক্ত হয়ে বলল, এ-ও জানেন না! তবে কি ঘোড়ার ডিমের লেখাপড়া শিখেছেন মশাই। ভালুকরা ত ঐ একটা কথাই জানে, এ ফ্রেণ্ড্ ইন নিড্, এ ফ্রেণ্ড ইনডিড্।

তোমার মাথা! ব্রজদা গর্জন করে উঠলেন। এ ভালুক

তোকে কে বললে? অপ্সরীর মত মেয়ে, তাকে বলে কিনা ভালুক! চোখের মাথাটি খেয়ে বসে আছ দেখছি। ইস্টুপিট, ইডিয়েট কোথাকার।

সুনীল থতমত খেয়ে বললে, আমি ভালুক বলব কেন? আপনিই ত বললেন।

আমি বললুম? আমার বলা শেষ করতে দিলি তোরা? ব্রজদা গজ গজ করতে লাগলেন। বললেন, সবটা আগে শুনবি ত।

যতুদা বললেন, ওদের কথায় কান দেন কেন? আপনি ত বলছেন অপ্সরা। ওহো, বুঝেছি। এই বুঝি সেই তুষার-নারী।

ব্রজদা গম্ভীরভাবে বললেন, রাইট ইউ আর। এই মেয়েটিই আমার লভে পড়ে গিয়েছিল। আমাকে এভারেস্টের খিড়কি দরজার হদিশ বলে দিয়েছিল। সেদিন হাইজাম্পটি দিয়ে এভারেস্ট ডিঙ্গোলাম বটে কিন্তু মেয়েটিকে চিরজীবনের মত হারালাম। পারুকে কথা দিয়েছিলাম, এভারেস্টে ওঠার পর ওর কাছে ফিরে যাব, তা আর পারলাম কই?

ব্রজদা ফোঁস করে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, ব্রজদা, পারু কে?

ব্রজদা বললেন, ঐ সেই তুষার-নারী, ওরা ত পর্বত-দুহিতা অর্থাৎ পার্বতী। তাই আদর করে পারু বলতাম। খুবই লাইক করত আমাকে।

যতুদা বললেন, আচ্ছা, অমন একটা মেয়েকে আপনার প্রথমে এই ইয়ে বিয়ার (যতুদা আর ভালুক বলতে সাহস পেলেন না।) বলে মনে হল কেন? আপনার ত এমন ভুল হয় না।

ব্রজদা বললেন, শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ওরা আগাপাশতলা লোমস ভালুকের চামড়ার পোশাক পরে। তাই

প্রথমটা আমার ঐ রকম একটা ভ্রম হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আমার ভুল ভেঙ্গেছিল। প্রথম কথাটি শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও কে?

উসখুস করে সুনীত জিজ্ঞাসা করল, কথাটা কি? প্রথমে আপনাকে উনি কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

ব্রজদা বললেন, কি আবার বলবে? ভাল ভাল হিরোইনরা প্রথম সাক্ষাতে হিরোদের যা বলে, তাই বললে। সেই সঙ্গীত সঙ্কেত ডিসাইফার করলে কথাটার মানেটা দাঁড়ায়ঃ পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?

দশ

জুজুৎসু জানা না থাকলে খবরদার গণ্ডার ধরতে যাস নি। রিক্‌স্ আছে।

কথাটা বলেই ব্রজদা সুনীতের দিকে চাইলেন।

সুনীল বললে, ভাল লোককেই কথাটা বললেন বটে ব্রজদা। সুনীতবাবু নিজে হাতে কখনও একটা ছারপোকা ধরেছেন কি না জিজ্ঞেস করুন তো।

ছারপোকা! সুনীত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বাঃ, কি যে বলেন, ছারপোকা ধরা কি এমন শক্ত।

শক্ত বৈ কি? জুজুৎসু জানলে গণ্ডার কাবু করা যায়, কিন্তু জুজুৎসুতে ছারপোকা ঘায়েল করা যায় না। এ আমার নিজের চোখে দেখা কি না। আমার যিনি ওস্তাদ—জাপানের চ্যাম্পিয়ন জুজুৎসু বীর—

(ব্রজদা থামলেন। চোখ বুঁজে আলতোভাবে নিজের নাক কান মলে গুরুকে স্মরণ করে নিলেন।)

মিঃ গুরুমারা গুঁতোগাতা একবার কলকাতায় এসেছিলেন জুজুৎসুর খেলা দেখাতে। বড়লাটের আমন্ত্রণে। আমি তখন পটলডাঙ্গার মেস্-ডি-শান্তিনিকেতনে একখানা সিঙ্গিল সীটেড্

রুমে থাকি। ওস্তাদের ইচ্ছে আমার কাছেই কদিন থাকেন। কি আর করি, গেস্ট রুম থেকে একখানা ভালো দেখে তক্তপোশ এনে আমার পাশেই পেতে দিলুম। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর খানিকক্ষণ গল্প গুজব করে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দেখি অন্ধকারে প্রচণ্ড একটা হুটোপাটি চলেছে। ব্যাপারটা কি? তাড়াতাড়ি লাইট জ্বেলে দিলাম। ততক্ষণে মিঃ গুরুমারা গুঁতোগাতা গোটা কয়েক জুজুৎসুর গুঁতো ঝেড়ে তক্তপোশটার বারটা বাজিয়ে দিয়েছেন।

একটু অবাক হয়েই বললাম, ব্যাপার কি?

মিঃ গুরুমারা গুঁতোগাতা বললেন, শতোশতো সূচিখোঁচা দাগা।

ওস্তাদ জাপানী হলেও একটু বাঙ্গাল কছমের জাপানী। কিয়োটোর কুট্টি কি না। তাই মানেটা বুঝতে একটু দেরী হল। সমঝে নিয়ে একটু হেসে বললাম, ওস্তাদ, ভয় পেয়ো না, ওগুলো সূঁচের খোঁচা নয়। এদেশে এক রকম খুদে খুদে ডোমেস্টিক জানোয়ার আছে। আমরা বলি, ছারপোকা। হার্মলেস্। শুয়ে পড়ো।

ওস্তাদ আমার কথায় বিশেষ ভরসা পেলেন না। আলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে সারা গা দেখতে লাগলেন।

আর বলতে লাগলেন, গাটাগোটা ফুটো।

তা মিছে বলেন নি, বুঝলি। আমিও দেখলাম্ ছারপোকার কামড়ে ওস্তাদের গোটা গাটাই প্রায় ফুটো হয়ে গেছে।

ব্রজদা দম নেবার জন্য একটু থামতেই সুনীত বলে উঠল, বাঃ, জাপানী ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার ত বেশ একটা মিল আছে!

ব্রজদা বললেন, হবে না কেন, ওরিয়েন্টাল কান্ট্রি যে। আমরাও প্রাচ্য, জাপানীরাও প্রাচ্য। অরিজিন ত সেই বেদ। ইংরেজ এসেই না ভেদটা সৃস্টি করে দিলে। নইলে আদিতে শ্যাম, কম্বোজ, বোরোবুদুর, যবদ্বীপ, বালি, সিংহল, জাপান, ইস্তক, আমেরিকা, এ-সবই ত বৃহত্তর বঙ্গের অংশ ছিল। আমাদের ছিল। বাংলার সমৃদ্ধি, বাংলার সংস্কৃতি এককালে কোন তুঙ্গে উঠেছিল একবার চেয়ে ছাখ। আর সেই বাংলার আজ কি দুরবস্থা। এখন যে চান্স পাচ্ছে, সেই একখানা লাথি ঝেড়ে চলে যাচ্ছে।

ব্রজদা ফোঁস করে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, ডিফেক্টটা কি হয়েছে জানিস, পেঁচক আর তেমন করে ডাকছে না।

পেঁচক! মানে?

পেঁচা। বাংলা কি ভুলে গেলি? আউল।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, পেঁচা ডাকছে না, তা হয়েছে কি?

যা হবার তাই হচ্ছে। আবার কি হবে।

ব্রজদা চটে উঠলেন।

বললেন, প্রহরে প্রহরে পেঁচক 'বাঙ্গালী জাগো' বলে আর ডেকে উঠছে না। কাজেই বাঙ্গালী ঘুমুচ্ছে। একেই বাঙ্গালীর ছেলের একটু লেটে ওঠা অব্যেস, তার উপর জাগানেওলা নেই। আসল গুবলেট ত সেইখানেই। বুঝলি নে। নইলে জাগ্রত বাঙ্গালীর গায়ে হাত তুলবে এমন সাহস ভূভারতের কোন ব্রাদারের আছে!

যাকগে যাক, যা বলছিলাম তাই বলি।

ব্রজদা প্রসঙ্গে ফিরে এলেন।

সারারাত ধরে মিঃ গুরুমারা ছারপোকা মারার চেস্টা করলেন। হ্যাঁ, দেখলাম বটে, জাপানী অধ্যবসায় কাকে বলে! এক এক-

খানা করে কাঠ তক্তপোশ থেকে তিনি খুলে ফেললেন। কিন্তু কোথায় ছারপোকা। একটারও টিকি দেখা গেল না। আবার একটু একটু করে তক্তপোশটি জুড়ে আলো নিভিয়ে যাঁহাতক শোয়া অমনি "শতো শতো সূচিখোঁচা" ওস্তাদকে আবার দাগা দিলে। সারারাত এইভাবে লড়াই চলল। তোষক বালিশ ছিড়ে, তক্তপোশের কাঠগুলো ভেঙ্গে, ঘরটাকে লণ্ডভণ্ড করে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ওস্তাদ আমার হাওয়া দিলেন। এ দেশ ত্যাগ করেই চলে গেলেন। তাই বলছিলাম, বাঘ, ভালুক, হাতি, হিপো মারার চাইতে ছারপোকা মারা শক্ত। অন্তত আমার কাছে।

সুনীত বলল, আর গণ্ডার? গণ্ডার মারেননি ব্রজদা?

সুনীল দাবড়ে উঠল, কাকে কি কোশ্চেন করতে হয় মশাই এখনও পর্যন্ত তাই শিখলেন না। ব্রজদা কি এক আধটা গণ্ডার মেরেছেন? গণ্ডার হিসেব জিজ্ঞেস করুন।

ব্রজদা সস্নেহে বললেন, চিরটা কাল তোর একই রকম কাটল সুনীল। আজও তোতে পাক ধরল না। সেই ডাঁসাই থেকে গেলি। গণ্ডার কি বাঙ্গালী যে গণ্ডায় গণ্ডায় মারা পড়বে? আর তা ছাড়া এখানে কোথায় তুই গণ্ডায় গণ্ডায় গণ্ডার পাবি যে মারবি? মারা ত দূরস্থান, যে কটা বাঙ্গালী গণ্ডার আছে রিজার্ভ ফরেস্টে, সে কটা বাঁচিয়ে রাখাই এখন দারুণ সমস্যা।

ব্রজদা নড়ে চড়ে বসলেন।

বললেন, মাঝখানে ত আমাদের বনমন্ত্রীর নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কি, না গণ্ডারদের ছেলেপুলে হচ্ছে না। কত ডাক্তার কবিরাজ এল। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, বাইওকেমিক, আয়ুর্বেদী, য়ুনানি, ভেটিনারি, কত কি করা হল। কোন ফল হল না। বনমন্ত্রী সাহেব-ডাক্তার আনালেন। বড় বড় সব

গাইনোকলজিস্ট। যাদের হাতে পড়লে বাঁজা বউও কার্তিকের মা হয়। কিন্তু ওনারাও এখেনে ফেল মেরে গেলেন। গণ্ডারনীরা লজ্জায় তাদের সামনে বেরুলই না যে। সরকারের এক কাঁড়ি টাকা গজব হয়ে গেল।

তাই নিয়ে এজিটেশন হল। মিটিং প্রশেসন হল। কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা রেট পেয়ারদের স্বার্থে চারদিন ধরে স্পেশাল মিটিং ডেকে গলাবাজি করে, অবশেষে বিধান সভায় "অবিলম্বে গণ্ডারের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাব" পাঠিয়ে দিলেন। বিধান সভায় লেফটিস্ট গ্রুপ সরকারকে তুলো ধুনে দিলে। লোকসভায় প্রশ্ন উঠল। কম্যুনিস্ট দল বললে, কংগ্রেসী কুশাসনের প্রতিবাদে গণ্ডারদের এই ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ, ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামী আত্মত্যাগ, গণ্ডার সমাজকে আজ শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যে এনে ফেলেছে। বিশ্বের প্রগতিশীল সমাজ আজ দাবী করছে, সরকার হয় এই বিপ্লবী গণ্ডারদের বংশবৃদ্ধি ঘটান, নইলে গদী ছেড়ে দিন। পি-এস-পি বললে, ভারত আক্রমণে উদ্যত চীনের বিরুদ্ধে ভারত সরকার আজ পর্যন্ত কোন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় গণ্ডারদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তাঁরা ভাবছে, যে-দেশে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কেই অনাস্থা রয়েছে, সে-দেশে আর বাচ্চা পেড়ে কি হবে? গণ্ডারদের এই মনোভাবে সামাগ্রিকভাবে নেহরু সরকারের চীন-নীতি এবং বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর প্রতি গভীর অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে। জনসংঘ এবং হিন্দুমহাসভার মতে এটা অশাস্ত্রীয় জন্ম নিয়ন্ত্রণের অনুকূলে সরকারী প্রচার কার্যের ব্যাড্ এফেক্ট।

লোকসভার মেঝেয় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বিতর্কের প্রথম দিন

সবাইকে প্রচণ্ড গালাগাল দিলেন। পি-এস-পি'কে বললেন, মোট্‌লি ক্রাউড্‌। কমিউনিস্টদের বললেন, এদেশে ওদের শিকড় নেই, অন্যান্যদের বললেন, কমিউন্যাল। দ্বিতীয় দিন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং মডার্ণ জেনেটিক্‌সের উপর দেড় ঘণ্টা লেকচার দিলেন। গান্ধিজীর কথা স্মরণ রাখতে বলে সবাইকার কাছে দেশের ইউনিটি বজায় রাখতে আবেদন জানালেন। তৃতীয় দিনে গণ্ডার প্রসঙ্গ তুলে বললেন, এ বিষয়ে আমাদের নীতি পরিষ্কার। পাকিস্তান, পর্তুগাল, এমন কি চীন সম্পর্কে আমাদের যা পলিসি, গণ্ডারদের সম্পর্কেও তাই। কোয়ার্সন নয়, পারসিকিউশন থুড়ি পারসুয়েশন। বুদ্ধ, অশোক, গান্ধিজীর পন্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। গণ্ডারদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আর সে দায়িত্ব কেন্দ্রের নয়, রাজ্য সরকারের। অতঃপর সরকারপক্ষ প্রস্তাব আনলেন, এটা রাজ্য সরকারের জুরিসডিক্‌শন। স্পীকারের হস্তক্ষেপে বিরোধী দলের প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি নাকচ হয়ে গেল। রাজ্যের বনমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন, আমি হলপ করে বলতে পারি, গণ্ডারদের ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য কোন নির্দেশ আমার দপ্তর থেকে দেওয়া হয়নি। গণ্ডারদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কোন ব্যবস্থাও করা হয় নি। এখন গণ্ডাররা যদি তা সত্ত্বেও বংশবৃদ্ধি না করে, তার আমি কি করব ? সরকারের যেটুকু করার তা করেছেন। এই খাতে অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে। আর গণ্ডারের বাচ্চা না হওয়ার জন্য কে দায়ী, গণ্ডার না গণ্ডারনী, সেটা তদন্তের জন্য একটা একস্‌পার্ট কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি। বিখ্যাত শিকারী শ্রীব্রজরাজ কারফরমা হচ্ছেন সেই কমিটির চেয়ারম্যান।

ব্রজদা থামলেন। একটু দম নিলেন।

বললেন, অ্যাইসা রিপোর্ট দিয়েছিলাম না একখানা, কি বলব, একটু ব্যাকিং পেলে ঐতেই নোবেল প্রাইজটা পেয়ে যেতুম। ইতিহাস, ভূগোল, সায়েন্স, হাইজিন, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইস্তক দেহতত্ত্ব, কি না ছিল সেই রিপোর্টে। বিশ্বের জন্ম থেকে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম আর মানব জাতির ধ্বংসে দি এণ্ড্। সেই রিপোর্টটার সামারি করেই ত এইচ জি ওয়েলস্ "আউট-লাইন অব্ দি হিস্ট্রী অব্ দি ওয়ার্লড" বইখানা বের করে দিলে।

সুনীত ফস্ করে বলে ফেলল, সে কী, ওটা ত অনেক আগের বই! তখন ত আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্টই হয় নি।

ব্রজদা বললেন, ঐটেই ত বৃটিশদের বাহাদুরি। ব্যাটারা যেটা করে, আগে আগে করে। তা সে টুকলিফাইং-ই হোক, কি সাম্রাজ্যবিস্তারই হোক। জাতটা বড় হয়েছে কি অমনি অমনি।

সুনীল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তারপর গণ্ডারদের কি হল?

ঝড়াঝ্‌ঝড় বাচ্চা হল। হবে না! ব্রজদা বললেন, কেমন মোক্ষম জিনিষ সুপারিশ করেছিলাম।

সুনীতের ইদানীং এসব বিষয়ে একটু বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। মুখটি একটু নীচু করে জিজ্ঞেস করলে, জিনিষটা কি দাদা?

ব্রজদা বললেন, একটা স্বপ্নাদ্য তাবিজ। প্রসূতির গলায় কালো কার দিয়ে শনি-মঙ্গলবারে ঝুলিয়ে দিলে একেবারে অব্যর্থ ফল। এক পয়সা খরচা নেই, শুধু ঐ তাবিজটার যা কস্ট্। ওনলি পাঁচ সিকে।

তা সেই তাবিজ গণ্ডারনীর গলায় কে ঝোলালে?

ব্রজদা সুনীতের দিকে চেয়ে 'ঈশ্বর ওকে ক্ষমা কর' হাসি হাসলেন।

বললেন, আমি ছাড়া এ ভারতে রিয়েল জুজুৎসু আর কে জানে?

হলে হবে কি, ব্রজদা হতাশ গলায় বললেন, দেশে তো দিশি গুণীর কদর নেই। এই কাজটা যদি কোন সাহেব এসে করত ত দেখতিস। দেশে তার স্ট্যাচু তোয়ের হয়ে যেত। এই যে, জিম করবেটের নামে তোরা ন্যাশন্যাল পার্ক করে দিলি, আর তার যে গুরু, যে তাকে হাতে ধরে শিকার শিখালে, সে গেল ভেসে! কেন? না সে যে বাঙ্গালী। আজ বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যদি হোল ওয়ার্ল্ডে এই কনস্পিরেসি না হত ত দেখতিস, পজিশন কাকে বলে তা তোদের ব্রজদা জগৎবাসীকে দেখিয়ে ছাড়ত। পজিশন পাচ্ছে না বলেই ত বাঙ্গালী আজ স্থায়ীভাবে অপজিশনে চলে যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, জিম করবেটকে পাকড়ালেন কি করে?

ব্রজদা আমার মুখের পানে অগ্নি দৃষ্টি হানলেন।

বললেন, সেটা করবেটকেই জিজ্ঞেস করো।

সুনীল বললে, তিনি ত গত হয়েছেন। তাঁকে এখন পাই কোথায়?

ব্রজদা বললেন, তবে কিছুকাল অপেক্ষা কর। এত অধৈর্যই বা হচ্ছ কেন? এটুকু জেনে রাখতে পার, যে-ছোকরা এয়ার গান ছাড়া কিছু চালাতে পারত না, তাকে আমি হাতে ধরে ·৩৪৫ বোরের ম্যাঞ্চেস্টার রিপিটার ছোড়া শিখিয়েছি।

সেবার জিমু বললে, ওস্তাদ বাঘ মারা ত শেখালে, মারলামও অনেক, এখন ওতে অরুচি ধরে গেছে। এবারে হাতি মারার কৌশলটা শিখিয়ে দাও।

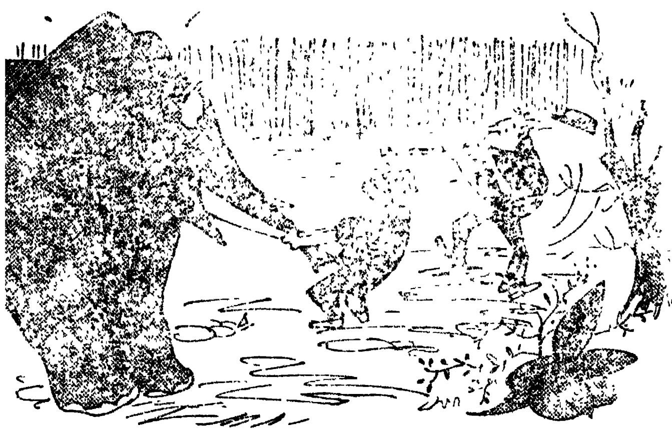
হেসে বললাম, জিমু, এখনও তেমন বাঘের পাল্লায় পড়নি। মেরেছ ত পাহাড়ি বাঘ। পড়তে বাংলার বাঘের পাল্লায়, বুঝতে। একবার এক বাংলার বাঘকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার করে দেওয়া হয়েছিল, তার ঠ্যালায় অস্থির।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে বৃটিশরা বাঘেদের আর কখনও ভাইসচ্যান্সেলার হবার চান্স দিয়েছে বলে শুনিনি। তাই বলছি বাঘকে অত তুচ্ছু ভেব না। অবিশ্যি হাতি মারা শিখতে চাও শিখিয়ে দেব।

কদিন পরেই খবর পাওয়া গেল আসামের জঙ্গলে একটা বুনো হাতি খুব অত্যাচার সুরু করেছে। খেত খামার নস্ট করে দিচ্ছে। বাড়িঘর তচনচ করছে। মানুষ মারছে। জিমিকে নিয়ে চললাম। ওকে বললাম, হাতি মারতে হয় এক গুলিতে। মিস্ করেছ কি গেছ। তোমাকে কিসমিস বানিয়ে ছেড়ে দেবে। আর হাতির ভালনারেব্‌ল্ জায়গাটা আছে মাথায়। শুঁড়টা যেখানে শেষ হয়ে কপালটা সুরু হয়েছে, জাস্ট্ অন ছাট্ স্পট্। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, হাতি যেন কক্ষনো তোমার গায়ের গন্ধ টের না পায়। খুব সাবধান। বাতাসের বিপরীতে কক্ষনো থাকবে না। অর্ডারটা যেমন বলে দিচ্ছি তেমনি বজায় রেখে চলবে। আগে বাতাস, মধ্যিখানে হাতি, তারপর তুমি। আমি হাতির কপালে চট করে একটা মার্কা করে দেব আর তুমি ঠিক সেইখানে চাঁদমারি করবে।

দিন তিনেক হেঁটে মিকির পাহাড়ের এক জায়গায় গিয়ে বুঝলাম, এসে গেছি। কিন্তু বিপদ হল এই যে হাওয়ার গতির মাথামুণ্ডু টের পাওয়া যাচ্ছিল না। কখনও এদিক দিয়ে বইছে একটু পরেই সেদিক দিয়ে। আচ্ছা ঝামেলা। বুদ্ধিটা উস্কে নেবার জন্য পকেট থেকে নস্যির কৌটা বের করে একটিপ নস্যি নিয়েছি কি, সামনের সবরি কলার ঝাড়ের আড়াল থেকে প্রচণ্ড শব্দে এক হ্যাঁচ্ছোঃ শোনা গেল। যেন বড় বড় গোটা চারেক হাউট্‌জার কামান একসঙ্গে কেউ ছাওড় করে দিলে। এক ফুৎকারে গোটা আষ্টেক কলার ঝাড় সবেগে উপড়ে গিয়ে জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। আর অমনি দেখলুম, দুহাত দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যমদূত

সদৃশ বিরাট এক টাস্কার। চুপিসাড়ে কলাগাছ খেয়ে যাচ্ছিল আমার এক্সট্রা র নস্যির কিছুটা হয়ত বাতাসে উড়ে ওর শুঁড়ের ফুটোয় ঢুকে গেছে। আর তাইতেই এই বিপর্যয়। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সেই অপ্রস্তুত দাঁতালের শুঁড়টা বাঁ হাতে চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে মাথাটা নুইয়ে আনলাম, তারপর ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে লাল টুকটুকে একটা টিপ বের করে থুথু দিয়ে ঝটিতি তার কপালে সেঁটে দিলাম। বললাম, জিমু, ফায়ার। কিন্তু কোথায় জিমু? দেখলাম, বেচারা তখনও পজিশন নিতে



হাতির মুখটা জিমুর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম

পারেনি। ইতস্তত করছে। আমি তৎক্ষণাৎ শুঁড় ধরে টেনে হাতির মুখটা জিমুর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। সত্যি, ছোকরার টিপটা প্রশংসা করার মতই। ঐ এক গুলিতেই মিকির পাহাড়ের সাক্ষাৎ শমনটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর উঠল না।

ব্রজদা চুপ করে গেলেন।

আপনাকে কোন জানোয়ার কখনও বিপদে ফেলেনি ব্রজদা?

ফেলোনি আবার! ব্রজদা নড়েচড়ে বসলেন। একবার একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারই আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। এ তোদের ব্রজদার উপর দিয়ে যায়। ব্রজদারও ব্রজদা বলতে পারিস তাকে।

সুনীত সাহস করে বলে ফেলল, এ ত তাহলে জবর টাইগার।

ব্রজদা বললেন, হ্যাঁ, বড় অদ্ভুত বাঘ। শুধু ধোপানী ধরে খেত। তাও সবটুকু খেত না। শুধু হাত দুখানা খেয়ে ফেলত।

সে কী, কেন?

ব্রজদা বললেন, অম্বলের ব্যামো ছিল বোধ হয়। ধোপানীরা ত সোডা দিয়ে কাপড় কাচে। হাতে নিরন্তর সোডা বা ক্ষার লেগে থাকে। তাই খেয়ে হয়ত টেম্পরারি একটা রিলিফ পেত। ওরা অকারণে ত কারোর ক্ষতি করে না। ভাল ভাল শিকারীর বই পড়ে দেখিস, জানতে পারবি।

এই বাঘটা আমাকে খুব ধোঁকা দিয়েছে। খুব ভুগিয়েছে। ওটাকে মারবার জন্য আমি গোটা ইণ্ডিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি। পায়ের দাগ ধরে ফলো করতে করতে বার্মা সিলোন পর্যন্তও চলে গেছি। ধোপাদের এমন একটা আড়ত ভারতে নেই, যেখানে আমি যাইনি। কিন্তু বৃথা। যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি হাহাকার। শয়তানটা স্বাভাবিক বুদ্ধি বশে এটা বুঝেছিল ধোপাদের চাইতে ধোপানীদের কাবু করা সহজ। জানিনে চণ্ডীদাস পড়েছিল কিনা। সাত বচ্ছরে সে দু হাজার পাঁচ শ পঞ্চান্নটা ধোপানীকে ঘায়েল করেছিল।

ওর ধোপানী মারার রহস্যটা আমার কাছে যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন আমি একদিন ঢাকুরের এক ডোবায় ধোপানীর ছদ্মবেশে কাপড় কাচতে সুরু করলাম। লোডেড্ রাইফেলটা বাঁ হাতের কাছে একটা কাপড়ের পুটুলির নিচে লুকিয়ে রাখলাম। আমি জানি, বাঘ

আজ এখানে আসবে। পায়ের তাজা ছাপ ডোবার পাড়ে দেখে বুঝলাম, রাত্তিরে এসে ও জায়গাটা সার্ভে করে গেছে।

ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে কাপড় কেচে চলেছি। কান দুটো খাড়া। দুপুর বেলা রোদ্দুর চড়চড় করছে। অনেকক্ষণ সেই পচা জলে দাঁড়িয়ে থাকায় পা চুলকুচ্ছে। সব সহ্য করছি। আজ এস্পার কি ওস্পার। হঠাৎ পিছনে জলে সামান্য একটা শব্দ হল। চট করে চেয়ে দেখলাম, কিছুই নেই। যেই আবার সামনে ফিরেছি, অমনি দেখি বাঘ। একেবারে আমার পাটের উপর থাবা গেড়ে বসে জিভ্ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। চট করে রাইফেলটার দিকে হাত বাড়ালাম। কিন্তু কোথায় রাইফেল? ঠাহর করে চেয়ে দেখি বাঘ সেটাকে কোন ফাঁকে সরিয়ে নিয়েছিল এখন সেটা ল্যাজে খেলাচ্ছে। কোন উপায় না দেখে উটপাখীর মত আমিও তৎক্ষণাৎ চোখ বুঁজে ফেললাম।

ব্রজদা গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম, তারপর?

ব্রজদা ম্লান হেসে বললেন, এর পরেও কি আর তারপর থাকেরে বোকা? তারপর বাঘটা আমাকে খেয়ে ফেলল।

যাঃ! সুনীত প্রতিবাদ করল। কি যে বলেন? এই ত দিব্যি বেঁচে রয়েছেন।

লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্রজদা ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, ছ্যাখ, তোদের ব্রজদা যে-চোখে একদিন বাঙ্গালীর ছেলে বিজয় সিংহকে লঙ্কা জয় করতে দেখেছে, আজ সেই চোখেই তাকে দেখতে হচ্ছে, বাঙ্গালীর ছেলে চারদিক থেকে মার খেয়ে পালিয়ে বাড়ির দরজায় এসে নেড়িকুত্তার মত কেঁউ কেঁউ করছে। একে কি তোরা বাঁচা বলিস?